পুত্রের প্রতি উপদেশ।

শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়

প্রণীত।

কালকাতা হাইকোর্টের উকীল

শ্রীশ্যামাদাস ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত।

[মূল্য ॥৹

প্রাপ্তিস্থান

(১) শ্রীশ্যামাদাস ভট্টাচার্য্য

৫ নং রামকান্ত মিস্ত্রী লেন,

(মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটের নিকট)

বহুবাজার পোঃ আঃ

কলিকাতা।

বুক কোম্পানী।

৪।৪ এ কলেজস্কোয়ার, কলিকাতা।

(গোলদিঘীর পূর্ব্বে)

কলিকাতা, ২।১ রামকান্ত মিস্ত্রী লেন,

ক্যালকাটা প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে,

শ্রীঅক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত

ভূমিকা।

সন ১৩১৮ সালের পূজাবকাশে আমি সপরিবারে পুরুলিয়া সহরে বাস করিতেছিলাম। সঙ্গে আমার প্রাণাধিক প্রিয়, এক্ষণে পরলোকগত পুত্র চণ্ডী দাস ছিলেন। তিনি তখন বিএ পরীক্ষার জন্য অধ্যয়ন করিতেছিলেন। এবং সেজন্য অনেক সময় আমার নিকট থাকিতে পারিতেন না। কিন্তু তাঁহাকে তৎপূর্ব্বে সর্ব্বদাই নিকটে রাখিয়া উপদেশ ও আচরণ দ্বারা শিক্ষা দিবার চেষ্টা করিতাম। তখন তাহাতে সুবিধার অভাব বুঝিয়া উপদেশ লিপিবদ্ধ করিয়া দিতে ইচ্ছা হয়। তদনুসারে এই কয়েক পৃষ্ঠা রচনা করি। ইহা পাঠ করিয়া আমার উক্তপুত্র অতীব আনন্দানুভব করেন, বিশেষতঃ ইহাতে যাহা যাহা লিখিত হইয়াছিল তদনুসারে তিনি চিরদিনই চলিয়া আসিতেছিলেন, ইহাই তাঁহার বিশেষ আনন্দের কারণ। তৎপরে আমার কয়েক জন শ্রদ্ধাস্পদ শিক্ষাকার্য্যে অভিজ্ঞ বন্ধু ইহা পাঠ করিয়া সাধারণতঃ বিদ্যার্থিগণ যাহাতে ইহার উপকারিতা উপভোগ করিতে পারেন, তজ্জন্য আমাকে অনুরোধ করেন তাঁহাদের অনুরোধে ও আমার উক্ত পুত্রের অভিপ্রায় বুঝিয়া ইহা কলিকাতাস্থ ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে পঠিত হয়। যে সভায় ইহা পঠিত হয় তাহাতে স্বর্গীয় পরমপূজ্যপাদ সার

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন সভা ভঙ্গের পর আমার এই সামান্য প্রবন্ধটী পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়, তিনি আমাকে ইহা প্রতিশ্রুত করান। ইহার অব্যবহিত পরেই, অদ্য হইতে ঠিক আট বৎসর পূর্ব্বে, আমার উক্ত প্রাণাধিক অশেষ সদ্‌গুণাধার পুত্র আমাকে অসীম শোকসাগরে ভাসাইয়া এবং সংসার অন্ধকার করিয়া পরলোক গত হন। ইহাতে এই প্রবন্ধটী প্রকাশ করার কথা কিছুদিন ভুলিয়া যাই। কিন্তু আমি পরমপূজ্যপাদ উক্ত বন্দ্যো-পাধ্যায় মহাশয়ের নিকট যে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম, তাহা স্মরণ করিয়া কর্ত্তব্যজ্ঞানে, যদিও বিলম্বে, ইহা প্রকাশিত করি-তেছি। ইহা অবশ্য সাধারণতঃ সকল শ্রেণীর সকল ধর্ম্মীর ভাল লাগিবে না। যাঁহাদের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি আমার মত তাঁহাদের ইহা প্রীতিকর হইতে পারে। তাঁহারা তাঁহাদের পরিবারস্থ শিক্ষার্থী বালকগণের উপদেশ পক্ষে এই সামান্য প্রবন্ধটীর উপকারিতা অনুসাধন করিলেই আমার আশা ও আকাঙ্খা চরিতার্থতা লাভ করিবে। ইতি—

শ্রীশিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য

৫নং রাম কান্ত মিস্ত্রির লেন।

কলিকাতা

সন ১৩২৭ সাল ২রা আষাঢ়।

নিবেদন

পরমারাধ্য পিতৃদেব এই প্রবন্ধ প্রকাশ করিবেন বলিয়া দেশপূজ্য স্বর্গীয় মহাত্মা গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট প্রতিশ্রুত ছিলেন। প্রকাশ করিবার সময় নানারূপ সাংসারিক ঘটনার জন্য তিনি উহা প্রকাশ করিতে পারেন নাই। গত ১৩৩০ সনের চৈত্রমাসের প্রথমে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া এক্ষণে শ্রীমৎ শঙ্কর পরমানন্দ তীর্থস্বামী নাম ধারণ পূর্ব্বক ৺কাশীধামে অবস্থিতি করিতেছেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বে ফাল্গুন মাসে তিনি আমার উপর এই কার্য্যভার দিয়া যান। তাঁহার আদেশ পালনার্থ আমি ইহা প্রকাশ করিতেছি ইহাতে তিনি ও তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের বন্ধুবর্গ সন্তুষ্ট হইলেই আমি কৃতার্থ হইব। ইতি

৫নং রামকান্ত মিস্ত্রি লেন।
চাঁপাতলা কলিকাতা
শ্রাবন—১৩৩২

শ্রীশ্যামাদাস ভট্টাচার্য্য

দ্বিতীয় সংস্করণের মন্তব্য।

প্রথম সংস্করণে ছাপার ভুল অত্যন্ত অধিক হইয়াছিল। ছাপার কার্য্যে আমার অনভিজ্ঞতাই তাহার প্রধান কারণ। তাহা সত্বেও আমার পরম শ্রদ্ধাষ্পদ পিতৃবন্ধুগণ ও অপরাপর সদাশয় মহাত্মারা এই পুস্তকের প্রতি যেরূপ স্নেহদৃষ্টি করিয়াছেন তাহাতে আমি কৃতার্থ হইয়াছি এবং তাঁহাদের প্রতি চির কৃতজ্ঞ হইয়াছি। প্রথম সংস্করণের পুস্তক নিঃশেষিত হইয়াছে এবং কলিকাতার ও মফস্বলের কয়েকটী প্রধান প্রধান বিদ্যালয়ে ইহা পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিতেছি। এবার ভ্রম প্রমাদ যাহাতে না থাকে তজ্জন্য বিশেষরূপে চেষ্টা করিয়াছি।

৫নং রামকান্ত মিস্ত্রির লেন।
কলিকাতা
পৌষ—১৩৩৩॥

ইতি—
শ্রীশ্যামাদাস ভট্টাচার্য্য।

সূচীপত্র।

পুত্রের প্রতি উপদেশ।

প্রাতরুত্থান।—অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিবে। সূর্য্যোদয়ের অন্ততঃ এক ঘণ্টা পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ করা চাই। যে সময়ে পূর্ব্ব দিক একটু একটু আলোকিত হইতে আরম্ভ হইতেছে অথচ আকাশে নক্ষত্র দৃশ্যমান থাকে, সেই সময়ই শয্যাত্যাগের প্রকৃষ্ট সময়। শয্যাত্যাগের পূর্ব্বে গাত্রোত্থান করিয়া শয্যার উপর নিদ্রা-ভঙ্গের পর একটু বসিয়া দেবতার নাম উচ্চারণ করিবে ও দেবমূর্ত্তি চিন্তা করিবে। যে পরিবারে যে দেবতার নাম বেশী, সে পরিবারের লোকের সেই নাম উচ্চারণ করা ও মূর্ত্তি-চিন্তা কর্ত্তব্য। তোমার কি কর্ত্তব্য তাহা তুমি স্বয়ং বিবেচনা করিয়া লইবে। তৎপরে গুরু লোককে স্মরণ করিবে। যাঁহাকে যাঁহাকে তোমার আন্তরিক ভক্তি হয়, যাঁহাদের নিকট তুমি কিছুমাত্রও সৎশিক্ষা লাভ করিয়াছ, যাঁহারা তোমাকে ভালবাসেন—যত্ন করেন, যাঁহাদের নিকট তুমি কোনও রূপ কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ আছ, এ প্রকার সকলকেই স্মরণ করিবে ও তাঁহাদের উদ্দেশে প্রণাম করিবে। যদি এইরূপ লোকের সংখ্যা বড় বেশী হয় তবে তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা চরিত্রবান, ও

সদগুণবত্তায়ও বিদ্যাবুদ্ধির আধার বলিয়া তোমার নিকট সমধিক আদৃত এরূপ কয়েকটি আদর্শ বাছিয়া স্থির করিবে; এবং তাঁহাদিগকে স্মরণ ও প্রণাম করিবে। তৎপরে শয্যাত্যাগ করিয়া কিয়ৎকাল ছাদের উপর বা গৃহ প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান হইয়া সেই সুনীল, অসীম তারকান্বিত গগনের দিকে একবার নিবিষ্টচিত্তে দৃষ্টিপাত করিবে ও সঙ্গে সঙ্গে ভাবিবে আকাশ কি অসীম! ইহার কূল কিনারা নাই। আমরা কতটুকুই বা দেখিতে পাই। আকাশ ব্যতীত অপর কোন অসীম বস্তু আর দেখ নাই; পৃথিবীর সীমা আছে, সমুদ্রের সীমা আছে; নিকটে হউক, দূরে হউক সীমা আছে তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু ঐ সুনীল আকাশের কোনদিকের সীমা নাই। এই অসীম আকাশের মধ্যে এই নক্ষত্র গুলি রহিয়াছে। তুমি বহুকাল হইতে পুস্তকে পড়িয়াছ, এই সকল নক্ষত্র এক একটি সূর্য্যের মত। বহুদূরে যে সকল নক্ষত্র আছে তাহাদের দেখিতে পাওয়া যায় না। জ্যোতির্বিবদগণ বলেন এমন নক্ষত্র অনেক আছে যাহারা এ পর্য্যন্ত মানবের নয়ন গোচর হয় নাই, অর্থাৎ আলোক এক সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল অগ্রসর হইয়াও দূরত্বের জন্য ঐ সকল নক্ষত্রের আলোক আজও পৃথিবীতে পৌঁছায় নাই। এই সকল নক্ষত্র, ও আরও অগণ্য নক্ষত্ররাজী অসীম আকাশের মধ্যে মধ্যে রহিয়াছে। আকাশেরও শেষ নাই, নক্ষত্রেরও শেষ নাই। আবার এই সকল নক্ষত্র আমাদের সূর্য্যের মত গ্রহগণে বেষ্টিত। সে সকল গ্রহ উপগ্রহ দূরবীক্ষণ সহকারেও দৃষ্টিগোচর হয় না। তাহাদের

অস্তিত্ব কেবল আনুমানিক, বিচারসাপেক্ষ মাত্র। এই সকল গ্রহ উপগ্রহ পরিবেষ্টিত অসংখ্য নক্ষত্ররাশির মধ্যে সূর্য্য একটি, তাহার চারিদিকে আরও কত গ্রহ উপগ্রহ নিত্য পরিভ্রমণ করিতেছে। এই সকল সূর্য্যাশ্রিত গ্রহের মধ্যে আমাদের পৃথিবী ও একটি গ্রহ মাত্র। সূর্য্য পৃথিবী অপেক্ষা বহু গুণ বড়, ও বহু দূরে অবস্থিত। আমরা এই পৃথিবীর উপর বাস করিতেছি। এই গ্রহনক্ষত্র বিভূষিত সমস্ত আকাশের সহিত তুলনায় আমরা কি অকিঞ্চিৎকর সামান্য বস্তু, এই বিষয়টা বেশ নিবিষ্টচিত্তে একটু বিবেচনা করিবে। আমি এখনই অনন্ত, অসীম আকাশের কথা বলিতেছিলাম। আর কোন অনন্ত, অসীম জিনিষ জান কি? যে জিনিষ যত বেশী সে জিনিষ সেই পরিমাণে সকলেরই অনায়াস লভ্য ও অক্লেশ প্রাপ্য। অপর যে অসীম পদার্থের কথা বলিতেছিলাম তাহা আর কিছু নয়—অনন্ত কালের কথা। কাল, পদার্থ কিনা সে বিষয়ে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ বিচার করুন। কিন্তু তুমি দুইটি অনন্ত বস্তু ভাবিবার জন্য পাইলে। ঐ উপরের, উপরেরই বা বলি কেন, ঐ চরিদিকের, উপরের—নীচের—পার্শ্বের অনন্ত আকাশ, আর এই অসীম সময়। সময় কবে সৃষ্ট হইল, তাহার কোথাও উল্লেখ নাই, অনন্ত কালের সৃষ্টিতত্ত্বের বিবয় কোন শাস্ত্রে আছে কি না জানি না। তবে এই সৃষ্টি কথাটাই অসঙ্গত। এই অনন্ত বা মহাকাল (eternal time) নিশ্চেষ্ট ভাবে চিরদিন পড়িয়া আছে এবং তদুপরি অনন্ত

মহাকাশে কি এক মহাশক্তির প্রভাবে কত গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতির সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হইয়া যাইতেছে। যাহা হউক এই অনন্তকাল ও অসীম আকাশের বিষয় একবার নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিবে। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে দিবালোক আসিয়া পড়িবে, কাকাদি পক্ষী ডাকিতে থাকিবে, এমন সময়, তুমিও জীবদেহের জান্তব ক্রিয়া সমাপন করণান্তর শুচি হইবে এবং পরিস্কৃত বস্ত্র পরিধান করিবে। পরিস্কৃত বস্ত্র বলিতে আমি মূল্যবান চাক-চিক্যশালী বস্ত্রের কথা বলিতেছি না। যাহাকে আমাদের আচারানুসারে পরিচ্ছন্ন বলে সেইরূপ ধৌত বস্ত্র পরিধান করিবে। তৎপরে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করা আবশ্যক।

প্রাতঃকৃত্য।—প্রাতঃসন্ধ্যা ও মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা প্রাতেই সমাপন করিবে। প্রাতঃসন্ধ্যার প্রকৃষ্ট সময় সূর্যোদয়ের একদণ্ড পূর্ব্ব হইতে একদণ্ড পর পর্য্যন্ত। * উহা মধ্যাহ্ন সন্ধ্যার কাল নহে, কিন্তু কি করিবে, উপযুক্ত সময়ে করিবার অবকাশ পাইবে না। তোমাকে দশটার মধ্যে আহারাদি সমাপন করিয়া বিদ্যালয়ে যাইতে হইবে। অগত্যা একেবারে মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা বর্জ্জন না করিয়া বরং সময়ের পূর্ব্বে করা ভাল। একেবারে কোন সন্ধ্যা বাদ দেওয়া ভাল নহে। সন্ধ্যার ও তৎপরে পূজার জন্য যে সকল উপকরণ আবশ্যক তাহা স্বয়ং সংগ্রহ করিবে। গঙ্গা বা নিকটস্থ নদী, অভাবে পুষ্করিণী বা

---

* ইহা শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের উপদেশ মত ও পরম পূজাপাদ পিতৃদেবের অনুমতিক্রমে সন্নিবিষ্ট করিলাম। সম্পাদক।

কূপ হইতে নিজে জল আনিবে। ফুল, বিল্বপত্র, তুলসীপত্র প্রভৃতি যাহা যাহা দরকার স্বয়ং আহরণ করিবে। এই সকল একস্থানে পাইবে না, নানা স্থান হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে। একটী কথা স্মরণ রাখিবে, পর্য্যুষিত পুষ্প, এবং গঙ্গাজল ব্যতীত পূর্ব্ব দিনের আহৃত জল ব্যবহার করা অনুচিত। বিল্বপত্র বা তুলসীপত্র পর্য্যুষিত হইলেও দোষ নাই। নিতান্ত ঠেকিয়া করিতে হয় তাহা আপদ্ধর্ম্মরূপে মনে করিবে। কিন্তু তাহা না করাই শ্রেয়ঃ। ইহা রীতিমত করিলে ইহকাল পরকালের মঙ্গল হইবে। এই পূজোপকরণ সংগ্রহ করিতে যে পথ ভ্রমণ করিতে হয় ও ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়, তাহাতে শরীর সুস্থ থাকে। পূর্ব্বে আমাদের দেশে প্রাতে ভ্রমণের ব্যবস্থা ছিল না; এটা বিদেশী লোকের সংস্পর্শে আমরা শিখিয়াছি। ধর্ম্মভাব কমিয়াছে, সন্ধ্যাপূজা বর্জ্জন হইতেছে বলিয়াই দরকার হইয়াছে। অনেকে এইরূপ ভ্রমণকে "বৃথাটন" বলেন। ইহা পাপ জনক। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ এইরূপ স্বাস্থ্যের জন্য প্রাতর্ভ্রমণ জানিতেন না। তাঁহারা প্রাতে ভ্রমণ করিতেন না, এমত মনে করিও না, খুবই বেড়াইতেন, কিন্তু উদ্দেশ্য, স্বাস্থ্যোন্নতি নহে, সন্ধ্যা পূজার উপকরণ আহরণ করা। বল দেখি শারীরিক স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য ঘুরিয়া বেড়ান এবং ভগবদর্চ্চনার জন্য পুষ্পাদি সংগ্রহ জন্য ভ্রমণ, দুইটি এক জিনিষ হইলেও কোন্ উদ্দেশ্যটি অধিকতর প্রশংসনীয়। আমাদের দেশে, আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে কেবল শরীররক্ষার জন্য কোন প্রয়াস

করিবার কোন ব্যবস্থা বা উপদেশ নাই। শরীর, ধর্ম্ম সাধনের আদ্য কারণ হইলেও নিজের শরীর লইয়া আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বিশেষ চিন্তিত ছিলেন না। শরীরী অর্থাৎ শরীরস্থ আত্মার ভাবনাই তাঁহারা ভাবিতেন। আত্মার উন্নতিকল্পে চেষ্টা করিতেন তাহাতে শরীর আপনা হইতেই ভাল থাকিত। একটি উদাহরণ দিয়া বুঝাইতেছি। মনে কর তুমি কোন লোকের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বড়ই যত্ন কর, আন্তরিক চেষ্টা কর। তিনি কিসে ভাল খাইবেন, ভালবস্ত্র পরিধান করিবেন ভালস্থানে শয়ন করিবেন. তদ্বিষয় অনুক্ষণ চেষ্টা কর, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার আবাসগৃহের কথা কি তুমি ভাবিবে না? তিনি যে গৃহে বাস করেন তাহা যদি বাসোপযোগী না থাকে তাহা হইলে তাঁহার কষ্ট হইবে সুতরাং তাঁহার স্থানটি সর্ব্বাগ্রে ভাল অবস্থায় রাখিবার জন্য স্বতঃই তোমার চেষ্টা হইবে। বর্ষার পূর্ব্বেই তোমার ভাবনা, ছাদে কোথাও জল পড়ে কিনা, হিম পড়িবার পূর্ব্বেই তোমার চেষ্টা, দরজা জানালা ঠিক আছে কিনা, দেখা। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে শরীরস্থ আত্মার মঙ্গলকারী মানব শরীরের কুশল সাধনে অবশ্যই যত্ন করিবে। সুতরাং তাহার জন্য বিশেষ ব্যবস্থার দরকার নাই। আত্মার কিসে প্রকৃত হিতসাধন হইবে তৎপ্রতি প্রতিনিয়ত লক্ষ্য রাখিলেই চলিবে।

এই পূজোপকরণ সংগ্রহ সম্বন্ধে আমার দুইটি মহাপুরুষের কথা স্মরণ হইতেছে, তাহা তোমার শিক্ষার জন্য সংক্ষেপ ভাবে

বলা আবশ্যক। একজন তোমার অপবর্গ প্রাপ্ত পিতামহদেব। তুমি যখন এক বৎসরের শিশু সেই সময় তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন, সুতরাং সে দেবদেহের বিষয় তোমার স্মরণ থাকিবার কথা নয়। তাঁহার কোন কথা এখানে বলিবার স্থান নহে, উহা অপ্রাসঙ্গিক হইবে, সময় পাইলে স্থানান্তরে বলিব। বলিবার অনেক কথা আছে, কারণ তিনি সাক্ষাৎ মঙ্গলময় দেবতা ছিলেন। এই লীলাক্ষেত্রে দেহধারণ করিয়া কত কি যে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, তাহা ধারণা করিবার আমাদের ক্ষমতা কোথায়? সে যাহা হউক যে সম্বন্ধে তাঁহার কথা এখানে উল্লেখ করিলাম এক্ষণে তাহাই বলি। তিনি অনেক রাত্রি থাকিতে উঠিতেন, অতি-প্রত্যূষে ফুলের সাজি হস্তে কত ধনী লোকের সুরক্ষিত, নির্ধনের অরক্ষিত পুষ্পোদ্যানে গিয়া ফুল-পত্রাদি চয়ন করিতেন। কলিকাতায় অবস্থান কালে প্রথম কিছুদিন তাঁহার একটু অসুবিধা বোধ হইয়াছিল। কিন্তু ভক্তের মনের কষ্ট ভগবানই বুঝেন, শীঘ্রই তাঁহার সে অসুবিধার অপনোদন হইয়াছিল। এক দিন তাঁহার কোন বন্ধুর নিকট তিনি উক্ত অসুবিধার কথা বলায় তাঁহার সেই বন্ধু কাশিমবাজারের স্বর্গীয়া মহারাণী স্বর্ণময়ীর তদানীন্তন কলিকাতায় কর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট বলিয়া মহারাণী মহাশয়ার কলিকাতাস্থ উদ্যানে অবাধে পুষ্পাদি সংগ্রহের সুযোগ করিয়া দিয়াছিলেন। তথায় গিয়া প্রতিদিন পিতৃদেব নানাবিধ পুষ্প ও বিল্বপত্রাদি প্রচুর আহরণ করিতেন। আবার কখন কখন

পিতৃদেবের পরম বন্ধু সর্ব্বদেশ-পূজিত মহামান্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাটীস্থ বাগান হইতে পুষ্প চয়ন করিতেন। ক্রমশঃ অনেক ভদ্রলোকের সহিত তাঁহার পরিচয় হওয়ায় তাঁহার পুষ্পচয়ন ক্ষেত্রের পরিসর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। এইরূপে তিনি প্রত্যূষে কত ভ্রমণ করিয়া কত ফুল, বিল্বপত্রাদি আনিতেন। কঠোর শীতের দিনে যখন অনেক লোক জুতা-মোজায় পাদদ্বয় আবৃত করিয়াও শীতে ক্লিষ্ট বোধ করেন, সেই সময় তিনি শূন্যপদে, শিশিরসিক্ত ও ধূলিবালুকা সংলগ্ন চরণে যখন প্রচুর ফুলভার লইয়া প্রহৃষ্ট মনে বাটী ফিরিতেন, তখন কি মনে হইত? রাজমুকুটধারী নরপতি হইতে দীনদুঃখী পর্য্যন্ত সেই চরণরেণুর ভিখারী হইত। সে যাহা হউক, ইহাতে তাঁহার শরীর ভাল থাকিত, মনও খুব প্রফুল্ল থাকিত। অপর যে মহাত্মার কথা বলিতেছিলাম, তিনি আমার স্বর্গগত পিসা মহাশয় ৺কালীকুমার বাচস্পতি। ইনি চিরদিন কাশীধামে বাস করিতেন। ৺বিশ্বেশ্বরের সংসর্গে থাকিয়া, কর্ম্মফলে ও চরিত্রবলে ইনিও জীয়ন্তেই শিবত্বলাভ করিয়াছিলেন। ইনি প্রায় ৯৫ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে বোধ হয় এক বৎসর কাল মাত্র শয্যাগত হন। শয্যাগত হইবার পূর্ব্বে চিরদিনই তিনি পূজার জন্য মাঠ হইতে কুশ, উদ্যান হইতে পুষ্প, বিল্বপত্রাদি এবং গঙ্গা হইতে স্বহস্তে জল আনিতেন। যখন ৯০।৯৩ বৎসরের বৃদ্ধ হাতে ঝুলাইয়া ঘড়া করিয়া গঙ্গা হইতে জল আনিতেন তখন তাহা দেখিয়া সকলেই

বিস্মিত হইতেন। শুধু তাহাই নহে, পূজোপকরণ সংগ্রহ সম্বন্ধে ইঁহার এত বেশী আগ্রহ ছিল যে, তাঁহার ইষ্টদেবের ভোগ্য আহার্য্য বস্তু প্রস্তুতও তিনি স্বয়ং করিতেন। এইরূপে প্রভূত পরিশ্রম করিয়া স্বধর্ম্ম পালনের ফল হইয়াছিল তাঁহার দীর্ঘজীবন এবং নীরোগ শরীর। তিনি প্রাতে ও সন্ধ্যার সময় ভ্রমণ করিতেন বটে কিন্তু সেটা শরীরের জন্য নহে, তাহা পূজোপকরণ সংগ্রহ জন্য। ধন্য তাঁহাদের ধর্ম্মনিষ্ঠা, ধন্য তাঁহাদের কর্ম্ম ও চেষ্টা। সেইরূপ সর্ব্বদা চেষ্টা করিবে।

কথা প্রসঙ্গে অপর এক কথা ঠিক প্রাসঙ্গিক না হইলেও সংশ্লিষ্ট বিবেচনায় বলিতেছি। কেবল স্বাস্থ্যোন্নতির চেষ্টায়, শরীর ভাল রাখিবার জন্য যেরূপ প্রাতে ভ্রমণ করিবার কথা বলিলাম তদনুরূপ আর একটা ব্যবহার আজকাল খুবই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, উহা বায়ু সেবন জন্য স্থান পরিবর্ত্তন। আমরা সকলেই কর্ম্মের দাস; জপাদি সৎকর্ম্মের কথা বলিতেছি না। আমরা কেহবা উদরান্নের জন্য, কেহবা বিলাসিতার দায়ে পড়িয়া প্রচুর অর্থসংগ্রহের জন্য, প্রতিনিয়ত কর্ম্মস্থলে, সহরে বা পল্লীগ্রামে বাস করি। কেহ কিন্তু একস্থানে চিরদিন থাকিতে সুখবোধ করেন না। না করিবার কথা বটে। একস্থানে, সেই একরূপ পথঘাট, বৃক্ষলতা, পশুপক্ষী, নরনারী, খাদ্যপেয়, আচার ব্যবহার কতদিন ভাল লাগিবে? তাহাতে মন ক্রমশঃ বিরক্ত হইয়া পড়ে এবং শরীরও অসুস্থ হয়। এটা আজ বলিয়া নয়, চিরদিনই হইতেছে। পূর্ব্বেও লোক

একস্থানে চিরদিন থাকিতে কষ্ট বোধ করিতেন, এখনও করেন। নিতান্ত যোগী না হইলে এক স্থান চিরদিন ভাল লাগিবে কেন? এই জন্যই বোধ হয় "স্থাণু" কথাটীর দ্ব্যর্থ হইয়াছে। যিনি যোগীশ্রেষ্ঠ, তিনিই কেবল একস্থানে চিরদিন থাকিতে পারেন। কিন্তু সাধারণ লোকের পক্ষে তাহা কষ্টকর, সেই জন্য পূর্ব্বকাল হইতে তাহার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু এক্ষণে সেই-ব্যবস্থার রকম ফের হইয়াছে, তাহাই এক্ষণে আমার বক্তব্য বিষয়। পূর্ব্বে তীর্থদর্শন বলিয়া একটা সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান ছিল। তীর্থস্থানগুলি সকলই খুব স্বাস্থ্যকর স্থান। কিন্তু স্বাস্থ্যের চেষ্টায় কেহ তীর্থে যাইতেন না, তাঁহারা যাইতেন ধর্ম্মকর্ম্মের জন্য। সেকালে যখন রেল ষ্টীমার ছিল না, যাঁহারা যানবাহন সংগ্রহ করিতে পারিতেন তাঁহাদের সংখ্যা খুব কম ছিল, অধিকাংশ লোকেই পদব্রজে বহুদূরে স্থিত ভারতের নানা স্থানে তীর্থে যাইতেন। কোথায় চট্টগ্রামের চন্দ্রনাথ আর কোথায় সমুদ্রকূলস্থ দ্বারকাপুরী, কোথায় সেই হিমাচল-শিখরস্থ বদরিকাশ্রম আর কোথায় সেই ভারত মহাসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ বেষ্টিত রামেশ্বর। এই সকল সুদূরস্থ স্থান সমূহে অবলীলাক্রমে সকলে যাইতেন, যাইয়া আপনাকে ধন্য মনে করিতেন, পুণ্য সঞ্চয় করিতেন, দৈহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য অবহেলা করিয়া আত্মার যাহাতে তৃপ্তি হয় তাহাই করিতেন; ইহকাল ভুলিয়া পরকালের ভাবনা ভাবিতেন। তীর্থবাসের আবার অনেকগুলি নিয়ম ছিল।

সংযতভাবে, ধর্ম্মচর্চ্চায় সময় অতিবাহিত করিতে হইত; শ্রাদ্ধতর্পণ, পূজা-অর্চ্চনা, জপহোমাদিতে তথায় কালাতিপাত করিতে হইত। এই সকল তীর্থস্থানে অনেক সাধু সন্ন্যাসী বাস করিতেন, এখন যে কোথাও করেন না তাহা নহে। তীর্থে যাইলে এই সকল মহাপুরুষগণকে দর্শন করা, তাঁহাদের উপদেশ গ্রহণ করা, কর্ত্তব্যকর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হইত। তীর্থে যাইয়া অন্ততঃ ত্রিরাত্রি বাস করিতেন, তাহাতে পথশ্রম দূর হইত, শরীর সুস্থ হইত, দুশ্চিন্তা স্থানে ধর্ম্মচিন্তা আসিয়া মনকে প্রফুল্ল করিত, আত্মা তৃপ্তিলাভ করিত। এই সকল ছাড়া ইহা একটি বড় সামাজিকতা শিক্ষারও উপায় ছিল। যে কোন তীর্থে যাইলে দেখিবে, ভারতের কত শত নরনারী আসিয়া সমবেত। বঙ্গের পুর্ব্ব প্রান্ত সীমাস্থ লোক, উত্তর পশ্চিমের অধিবাসী, পাঞ্জাবী, মহারাষ্ট্রী, দ্রাবিড়ী, ঔড্রদেশবাসী, সকল স্থানের নানা প্রকার লোক এক উদ্দেশ্যে এক স্থানে সমবেত। সকলেই সকলকে ভক্তি বিনম্রনয়নে দৃষ্টিপাত করিতেছেন, বল দেখি এমন সার্ব্বজনিক মহাসভা (congress) অন্য স্থানে হইতে পারে কি? যদি বিভিন্ন প্রদেশবাসী হিন্দুমণ্ডলীর একত্র সমাবেশ দেখিতে চাও, তীর্থে যাইবে। সকলের সহিত মিশিলে সকলের মনের ভাব, সামাজিক আচার ব্যবহার, বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয়াদি পাইলে তোমারও অভিজ্ঞতা বাড়িয়া যাইবে, হৃদয় প্রসারিত হইবে, প্রাদেশিক ভাব দূর হইবে। তাহা হইলে মহারাষ্ট্রীকে দেখিয়া বর্গী বলিয়া ভয় করিবে না, ঔড্রদেশবাসীকে

উড়িয়া বলিয়া ঘৃণা করিবে না, পূর্ব্ব-বঙ্গবাসীকে বাঙ্গাল বলিয়া ব্যঙ্গ করিবে না, এবং উত্তর-পশ্চিমের লোককে খোট্টা বলিয়া অভিহিত করিয়া নিজের মনের ক্ষুদ্রতা প্রকাশ করিতে হইবে না। মনে হইবে আমরা সকলেই এক। এত প্রকার উপকার সাধক তীর্থ যাত্রার স্থানে আজকাল ঘটিয়াছে কি? একেবারে ধর্ম্মকর্ম্মবিহীন সমাজ হইতে দূরস্থিত প্রান্তর বা জঙ্গলমধ্যে অবস্থান। যেখানে গিয়া কেবল শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য চেষ্টা, তাহা বৈধ উপায়েও বটে, অবৈধ উপায়েও বটে। সমাজের ভয়ে যে সকল আচার বাটিতে ঘটিয়া উঠে না, এই সকল নিভৃত স্থানে গিয়া কেহ কেহ তাহাই করিয়া থাকেন। কোন সামাজিক শিক্ষা হয় না, মনুষ্যত্বেরও বিকাশ হয় না। এ সকল ভাল আচার নহে, ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ।

বক্তব্য বিষয় হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। পুষ্পাদি চয়ন করিয়া আসিয়া, পদ ধৌত করিয়া পূজা গৃহে প্রবেশ করিবে এবং পূজার অপর যে কিছু আয়োজন করিতে হয় নিজেই করিয়া লইবে। অর্থাৎ চন্দনপেশন, নৈবেদ্য প্রস্তুত করণ প্রভৃতি কার্য্যও নিজেই করিয়া লইবে। তৎপরে পূর্ব্বে না করিয়া থাক, প্রাতঃসন্ধ্যা ও মধ্যাহ্নসন্ধ্যা করিবে। তদনন্তর পূজা। তোমার এখনও দীক্ষা হয় নাই, দীক্ষা হইলে পর গুরূপদেশ মত পূজা করিবে। এক্ষণে ব্রাহ্মণের যাহা অবশ্য কর্ত্তব্য তাহাই করিবে, শিবপূজা ও বিষ্ণুপূজা করিবে, পূজায় আড়ম্বর করিবে না, সামান্যভাবে ভক্তির

সহিত শিব ও বিষ্ণুর পূজা করিবে। সাধারণ কথা মনে রাখিবে, ভক্তের ভগবান। ভক্তির ন্যায় পূজার উপকরণ আর কিছুই নাই। আর শিবের প্রণাম মন্ত্রের একটী সার কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছি, তাহাই প্রকৃত কথা; "নিবেদয়ামি-চাত্মানং," বলিয়া যখন প্রণাম করিবে তখন প্রকৃত পক্ষেই সেই দেবাদিদেব মঙ্গলময় ভগবানে আত্মসমর্পণ করিবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি পূজায় আড়ম্বর করিবে না, যত সংক্ষেপে হয় সারিবে। স্তব স্তোত্রাদির বাহুল্যে অনেক সময়ক্ষেপ করা তোমার এক্ষণে উচিত নয়। এ সম্বন্ধে একটী কথা তোমার মনে আছে কিনা জানি না। একবার পূজার অবকাশে তুমি ও আমি ৺ কাশীধামে ৺দুর্গাবাড়ীর দক্ষিণে শঙ্কটমোচনের নিকট আমার পরম স্নেহাস্পদ শ্রীযুক্ত মনোমোহন দত্তের বাগানবাটীতে বাস করিয়াছিলাম। সে সময় উক্ত বাগানের নিকটস্থ আর একটী বাগানে একজন ব্রহ্মচারী বাস করিতেন। ব্রহ্মচারী বাঙ্গালীর ছেলে কিন্তু বহুদিন সংসার ত্যাগ করিয়া তখন হিন্দুস্থানী হইয়া গিয়াছেন। আমাদের প্রতি স্নেহ-পরবশ হইয়া তিনি মধ্যে মধ্যে আমাদের নিকট আসিতেন। তাঁহার সহিত অনেক সময়ে অনেক ভাল কথা হইত। তাহার মধ্যে এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয়টী মাত্র বলিতেছি। একদিন তাঁহাকে আমি জিজ্ঞাসা করি, "আপনি দৈবকার্য্য প্রত্যহ কি করেন ?" তাহাতে তিনি যে উত্তর দেন, তাহা স্মরণযোগ্য। তিনি বলিলেন, "আমি প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা, শিবপূজা ও বিষ্ণুপূজা

ব্যতীত অপর কিছুই করি না।" এমন কি সময়াভাবে তাঁহার প্রত্যহ গঙ্গাস্নান ও দেবদর্শনও ঘটিয়া উঠিত না। তিনি তখন দর্শনশাস্ত্রে মনোনিবেশ করিয়াছেন। ভগবান বিশ্বেশ্বরের কৃপায় সদ্‌গুরু লাভ করিয়াছেন, এবং তাঁহার নিকট ষড়্‌দর্শন অধ্যয়ন করিতেছেন। অপরের দয়ায় জীবিকা চলিতেছে, তিনি অনন্যকর্ম্মা হইয়া কেবল অধ্যয়ন করিতেছেন। তিনি বলিলেন "এক্ষণে দর্শনশাস্ত্র আয়ত্ত করাই তাঁহার লক্ষ্য, বিদ্যাভ্যাসই তাঁহার তপস্যা" আমি বলি, তোমারও এখন তাহাই। বিদ্যাভ্যাসই তোমার তপস্যা, নিতান্ত ব্রাহ্মণ্য রক্ষার জন্য যাহা দরকার, তাহা ব্যতীত আর কিছুতেই মনোনিবেশ করিবে না, করিলে উপকার না হইয়া অপকার হইবারই সম্ভাবনা। বঙ্গদেশের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মপ্রচারক ও পণ্ডিতাগ্রগণ্য চৈতন্যদেবও শিক্ষা শেষ না করিয়া ধর্ম্মকর্ম্মে মনোনিবেশ করেন নাই।

পাঠাভ্যাস—এইরূপে প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তর পাঠাভ্যাসে মনোযোগ দিবে; কিন্তু নিজের পড়াশুনা করিবার পূর্ব্বে তোমার কনিষ্ঠ সহোদরের লেখাপড়ার দিকে দৃষ্টি করিবে। যদিও আমি তাহার লেখাপড়া দেখিতেছি এবং যাহাতে তাহার পড়াশুনা ভাল করিয়া হয়, তদ্বিষয়ে মনোযোগী আছি, কিন্তু এ কথা তোমার সর্ব্বদা মনে রাখা চাই যে, তাহার লেখাপড়া যাহাতে ভালরূপে হয় তাহার তত্ত্বাবধান করা এবং তাহার প্রয়োজনানুসারে তাহাকে সাহায্য করা

তোমারও কর্ত্তব্য। ইহাতে তাহার পড়াশুনা ভাল হইবে এবং ইহার আর একটী অবান্তর সুফল আছে। ইহাতে সৌভ্রাত্র যেন আরও ঘনিষ্ঠ হয়। এ সম্বন্ধে একটী বিষয় তোমাকে সাবধান করিয়া দিতেছি। যদি তোমার কনিষ্ঠ তোমার শিক্ষার অর্থগ্রহণ শীঘ্র করিতে না পারে, তাহা হইলে তুমি তাহার উপর রাগ করিবে না, বা কোনরূপ বিরক্তি প্রকাশ করিবে না। তাহাকে শাসন করিতে নিষেধ করি না, তবে শাসন যেন এমত না হয় যে, ভবিষ্যতে সে তোমার নিকট পড়িতে বা শিক্ষার জন্য যাইতে সঙ্কোচ বোধ করে। বিদ্যাভ্যাস পক্ষে ইহা অপেক্ষা ক্ষতিকর আর কিছুই নাই। তাহাকে নিঃসঙ্কোচে ও অবাধে তোমার নিকট পড়া বলিয়া লইতে দিবার সুযোগ দেওয়া চাই। তবে তোমারও পড়াশুনা আছে, সুতরাং একটা সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবে, ঠিক সেই সময়ে তোমার নিকট শিক্ষা লাভ করিবে। যদি তাহার শিক্ষা সম্বন্ধে কোন প্রকার ত্রুটি বা অভাব বোধ কর তাহা আমাকে জানাইবে। তৎপরে তুমি যতক্ষণ সময় পাও, নিজের লেখাপড়া করিবে। কতক্ষণ কোন বিষয় পড়িবে বা কি ভাবে পড়িবে, তাহা এখন আর তোমাকে বলিয়া দেওয়া নিস্প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মাধীনে লেখাপড়া করিতে হইবে। যে কয়টি বিষয়ে পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছ, সকল বিষয়ের আপেক্ষিক গুরুত্ব বিবেচনায় সময়ক্ষেপ করিবে। তবে একটী কথা মনে রাখিবে, যাহা আজ করিতে পার, তাহা কাল করিবে

বলিয়া রাখিয়া দিবে না। যখন যাহা পড়িবে, তাহাতে সম্পূর্ণ-রূপে মনোনিবেশ করিবে। যখন দেখিবে কোন বিষয় অধ্যয়ন করিতেছ, অথচ তাহাতে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ হইতেছে না, তখন তাহা অধ্যয়ন হইতে ক্ষান্ত হইবে।

আহার—পড়াশুনা শেষ করিয়া আহার করিবে। কোনরূপ দুশ্চিন্তা না করিয়া স্ফূর্ত্তির সহিত আহার করিতে যাইবে। * আহার সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে। তাড়াতাড়ি আহার করিবে না, আস্তে আস্তে চর্ব্বণ করিয়া খাইবে। আস্তে আস্তে খাইলে ক্ষুধার পরিমাণের সহিত সামঞ্জস্য হইতেছে কিনা তাহা বেশ বুঝিতে পারিবে এবং তাহা হইলে যখনই খাদ্য ভাল লাগিতেছে না মনে করিবে অমনই আহার বন্ধ করিবে। তদভাবে উদরাময় হইবার সম্ভাবনা। কি খাইবে, কি না খাইবে, সে ভাবনা তোমার জননীর, তোমার সে বিষয়ে কোন চিন্তা করিতে হইবে না। তিনি যাহা দিবেন তাহাই আহার করিবে। আহার সম্বন্ধে একটা মোটা কথা আছে, "কেহ কেহ আহারের জন্য জীবন ধারণ করেন, অপর কেহ জীবন ধারণ জন্য আহার করেন।" বলা বাহুল্য প্রথোমোক্ত লোককে সকলে ঘৃণা করেন। এই সকল উদর-পরায়ণ ব্যক্তি চিরদিনই সকলের নিকট ঘৃণিত। সমাজে ঘৃণিত, পরিবার মধ্যে কিছু বলুন বা না বলুন, ঘৃণিত। আহার

---

* আমার শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু, শিক্ষা কার্য্যে সুদক্ষ ৺বিশ্বেশ্বর মিত্র মহাশয় এই কথাটী লিখিতে বলিয়া দিয়াছিলেন।

যতটা অকৃতকার্য্য হইবে ততটাই প[illegible]। জীবন [illegible] করা আবশ্যক এবং তজ্জন্য যতটুকু আহার না করিলে চলিবে না ততটুকুমাত্র আহার করা চাই; আহার্য্য বস্তু অস্বাস্থ্যকর না হইলেই হইল। সুমিষ্ট আহার্য্য জিনিস খাইয়া সুখবোধ করিবার চেষ্টা করা মনুষ্যত্বের লক্ষণ নহে। ভাল জিনিষ অবশ্য সকলেরই ভাল লাগিবে, তোমারও ভাল লাগিবে, তাহা খাইতে নিষেধ করিনা। তবে তাহার জন্য চেষ্টা করিবে না, আকাঙ্খা করিবে না। তাহার জন্য স্পৃহা থাকিবে না, লালসা থাকিবে না। অযাচিত ভাবে সম্মুখে উপস্থিত হইলে অবশ্য ত্যাগ করিবে না। এই জিনিসটী খাইতে ভালবাস, এই জিনিসটী না হইলে আহার হয় না, অথবা এই জিনিসটী খাইতে পার না, বা চাহ না, এরূপ কথা লজ্জার বিষয়। যাহা কেহ খাইতে পারে তাহাই তোমার আহার্য্য; তবে পানাহার সম্বন্ধে শাস্ত্রবাক্য, দেশাচার, লোকাচার, পারিবারিক আচার মানিয়া চলিবে। খাইতে বসিয়া বিচার করিবে না। শাস্ত্রে যাহা নিষিদ্ধ অথবা আপৎ কালে বা নাচারে পড়িয়া খাইবার বিধি আছে, তাহা বর্জ্জন করিবে। এমন অনেক জিনিস আছে যাহা শাস্ত্রে নিষেধ নাই, অথচ দেশাচার বা লোকাচার অনুসারে আহারে নিষিদ্ধ, এরূপ বস্তু কদাচ খাইবে না। আবার অনেক পরিবারে অনেক বস্তুর ব্যবহার নিষিদ্ধ আছে। বাটীর গৃহিণীরা এ বিষয়ের শাস্ত্রকর্ত্রী। তাঁহাদের কথা মান্য করিয়া চলিবে, তাঁহাদের নিষেধ বাক্য অবশ্য প্রতিপাল্য। মোট

কথা পানাহার সম্বন্ধে যে কেহ যাহা কিছু নিষেধ করেন, তাহা ত্যাগ করিবে। তাহা ব্যতীত যে যাহা দেন, তাহাই গ্রাহ্য।

একত্র খাইতে বসিয়া একত্র ভোজন শেষ করিবে। ভোজনে হয়ত একজনের কিছু বেশী বিলম্ব হয়, তাহাকে ত্যাগ করিয়া উঠা উচিত নয়। যদি তোমার বিশেষ তাড়াতাড়ি থাকে, পৃথক স্থানে আহার করিতে বসিবে। কিন্তু ভাই ভগিনী সকলের একত্রে ভোজনে বসা বড় ভাল; যতটা পার তাহা করিবার চেষ্টা করিবে। খাইতে বসিয়া কোন জিনিস ভাল লাগিল বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করা পেটুকের লক্ষণ, অথবা কোন জিনিস খারাপ হইয়াছে বলিয়া বিরক্তি বা অসন্তোষ প্রকাশ করাও পেটুকের অপর লক্ষণ। কোন ব্যঞ্জন ভাল পাক হইয়াছে, কি কোন আহার্য্য তোমার খুব ভাল লাগিয়াছে বলিয়া আর তাহা চাহিবে না, বা এমত ভাব প্রকাশ করিবে না যে, সেই বস্তু আর একটু পাইলে তুমি সন্তুষ্ট হও। আহারে সংযম শিক্ষা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। সংসারে অনেক বিষয়ে সংযম শিক্ষা করিতে হইবে। তন্মধ্যে আহারে সংযম শিক্ষা প্রধান। আহারের পরিমাণও ঠিক রাখিবে। কোন দিন কম, কোন দিন বেশী খাইবে না। একত্র খাইতে বসিয়া কাহারও সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া কখনও বেশী খাইবে না, অথবা অপরিচিত লোকের সাক্ষাতে কখনও লজ্জা করিয়া কম খাইবে না। আহারের পরিমাণ খুব বেশী হইলেই যে লোক দীর্ঘজীবি হয়, তাহা কখন মনে করিবে না। পরিমাণ অভ্যাস সাপেক্ষ,

ইহার বিশেষ কোন নিয়ম বা বিধি নাই। একজনের যাহা প্রচুর, অপরের হয়ত তাহা কিছুই নয়। সুতরাং তাহার একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম কিছুই করা যাইতে পারে না। আহার করা একটা ভোগ বা আমোদের বিষয়, কখন মনে করিবে না। ইহা জীবন রক্ষার জন্য একটা কর্ত্তব্য পালন মাত্র। এই ধারণায় কার্য্য করিবে। তাহা হইলে বুঝিবে যে ইহাতে মনের সুখ বা ইহার অভাবে মনের দুঃখ কিছুই নাই।

প্রসঙ্গক্রমে আহার সম্বন্ধে আর একটী কথা বলিয়া রাখি। তোমাকে সমাজ মধ্যে বাস করিতে হইতেছে। অনেক সময়ে অপরের গৃহে আহার করিতে বাধ্য হইবে; কিন্তু সেখানে একটু নিয়ম শিথিল করিতে হইবে, নিতান্ত যাহা ধর্ম্মানুসারে নিষিদ্ধ, তাহা ছাড়া অপর কোন জিনিস ত্যাগ করিবে না। ভাল না লাগে খাইবে না, কিন্তু তাহাতে তোমার আপত্তি আছে, এ কথা ভ্রমক্রমেও জানিতে দিবে না। গৃহস্বামী যাহা কিছু আয়োজন করিয়া দিবেন, তাহা হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করিবে। দুষ্পাচ্যাহার অল্প মাত্রায় আহার করিবে। সমাজে বাস করিতে অনেক অনভ্যস্ত ব্যবহার সহ্য করিতে হইবে। ইহা তাহার মধ্যে একটা। কোন জিনিস খাওনা, বা খাইতে পার বলিয়া, কখন ও বাহাদুরি করিও না। এটা নিতান্ত বালকত্ব। একটা গল্প বলি। একজন অত্যন্ত গরম আহার করিতে পারেন বলিয়া এক স্থানে বাহাদুরি করিতেছিলেন, সেই স্থানে কোন কার্য্যোপলক্ষে লোক জন খাওয়ান হইবে, কচুরি

ভাজা হইতেছিল। একজন উক্ত ব্যক্তিকে বলিলেন, আচ্ছা তুমি যে বড় বাহাদুরি করিতেছ, ঐ যে কচুরি ভাজা হইতেছে, খোলা হইতে তোলা মাত্র খাইতে পার? তাহাতে সে ব্যক্তি পাগলের মত রাজি হইল, এবং অগ্রসর হইয়া খোলা হইতে তৎক্ষণাৎ উত্তোলিত একখণ্ড কচুরি লইয়া যেমন কামড় মারিল, অমনি কচুরি-মধ্যস্থ উত্তপ্ত ঘৃত তাহার মুখ বিবর দগ্ধ করিয়া ফেলিল। ফলে তিনি বাহাদুরি দেখাইতে গিয়া প্রায় সপ্তাহ কাল কষ্ট পাইয়া অনেককষ্টে ও চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করিলেন। এরূপ পাগলামির গল্প অনেক আছে। এরূপ বাহাদুরি যাহারা করে, তাহারা নিতান্ত পাগল। অপর কথা যাহা বলিলাম কোন জিনিস খাওনা বলিয়া স্পর্দ্ধা করিবে না। অনেক লোক মৎস্য মাংস খান এবং অনেকে খান না, খান না বলিয়া তাঁহাদের বাহাদুরি কিছুই নাই। গবাদি পশুরাও মৎস্য মাংস খায় না। তাহাতে তাহাদের বাহাদুরি কি? ত্যাগে বাহাদুরি করা উচিত নয়। তাহাতে এক দিকে যেমন বস্তুগত ত্যাগ করিলে, তেমনি অপর দিকে মানসিক দৌর্ব্বল্যও দেখাইয়া নিজের মনুষ্যত্বের অভাবের পরিচয় দিলে। এরূপ বিপরীত ব্যবহার সদাচার বহির্ভূত। খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে অপর এক কথা বলিয়াছি—অস্বাস্থ্যকর জিনিস খাইবে না। কোনটি স্বাস্থ্যকর, আর কোনটি নহে, ইহা, আমাদের পক্ষে জানা কঠিন নহে। যাহারা শাস্ত্রশাসন মানে, লোকাচার দেশাচার মানে, তাহাদের পক্ষে খাদ্যাখাদ্য বিচার

করা সহজ কথা। আমাদের দেশীয় লোকে সাধারণতঃ যাহা অস্বাস্থ্যকর বলেন,বা যাহা তোমার অভ্যাসানুসারে গ্রহণকরিতে কষ্ট হয়, তাহা না খাওয়াই ভাল। এমন অনেক জিনিস আছে, যাহা একজনের কাছে সুখাদ্য, কিন্তু অপরের পক্ষে তাহা ত্যজ্য দৃষ্টান্তস্বরূপ দুই একটী জিনিসের উল্লেখ করিতেছি।. ইংরাজেরা অয়েষ্টার বলিয়া এক প্রকার শম্বুক, পনীর প্রভৃতি কয়েকটী জিনিস বড় সুখসেব্য বলিয়া ব্যবহার করেন, কিন্তু অনভ্যস্ত লোকের নিকট এই সকল বস্তুর গন্ধ অতিশয় পূতিগন্ধ বলিয়া মনে হয়। পরের কথা কেন, আমাদের দেশেরই উত্তর পূর্ব্ব অঞ্চলের অনেক ভদ্র পরিবার মধ্যে শুষ্ক মৎস্যের খুব ব্যবহার আছে, কিন্তু উহা আমাদের কাছে কিরূপ দুর্গন্ধময় বোধ হয়? আমাদের ভিতর হিঙ্‌এর গন্ধ, পূতিনাশাকের গন্ধ, কেহ কেহ সুগন্ধ মনে করেন, আবার কেহ কেহ সে গন্ধ সহ্য করিতে পারেন না। সুতরাং গন্ধ দ্বারা কোন্ বস্তু অস্বাস্থ্যকর কোন্ বস্তু স্বাস্থ্যকর, তাহা বুঝা কঠিন। পর্য্যুষিত বস্তু মাত্রেই পরিত্যাজ্য। বাসিপক্ক অন্ন, ব্যঞ্জন ব্যবহার করিবে না। তাহা যে একেবারে সকল সময় অস্বাস্থ্যকর তাহা বলি না। পুঁকাল ভোগ খাইয়া উড়িষ্যায় কত শত লোক বাঁচিয়া আছে। আর জিনিস পচিলেই যদি অস্বাস্থ্যকর হইত, তাহা হইলে পচা মৎস্যপ্রিয় চীন ও ব্রহ্মবাসীগণকে আর কেহ দেখিতে পাইতেন না। সুতরাং বিচার করিয়া স্বাস্থ্যকর কি, আর অস্বাস্থ্যকর কি তাহা জানা কঠিন। আবার এমন অনেক বস্তু আছে, যাহারা

স্বতন্ত্র ভাবে বড় ভাল জিনিস, উপাদেয়ও বটে, স্বাস্থ্যকরও বটে; কিন্তু সংযোগে বিষময় ফল প্রসব করে। এই সকল বিষযোগ কিসে কিসে হয় জানা আবশ্যক। ইহা কবিরাজী সুশ্রুতাদি গ্রন্থে পাওয়া যায়। কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের দেশীয় ভাবে চালিত পরিবার মধ্যে অনেকেই অনেকটা অবগত আছেন। "মধুসর্পী" একটা প্রবাদ বাক্যের ন্যায় সকলেই জানেন। দুইটিই অমৃতবৎ উত্তম পদার্থ অথচ উভয়ের যোগে দারুণ বিষ উৎপন্ন হয়। দুগ্ধের সহিত লবণ সংযোগ, কুলের সহিত মিষ্ট, তাম্র পাত্রে দুগ্ধ, কাংসপাত্রে নারিকেল জল, ইত্যাদি অনেক অনেক অনিষ্টকর যোগের কথা অনেক স্ত্রীলোকও জানেন। এ সকল নিষেধ বাক্য যাহার নিকট শুনিবে অগ্রাহ্য করিবে না। অবিশ্বাস করিয়া ব্যবহার পূর্ব্বক তাহার বিষময় ফল ভোগ করার আশঙ্কা অপেক্ষা বিশ্বাস করিয়া ব্যবহার না করিয়া নির্ভাবনায় থাকা ভাল নয় কি? এখন সর্ব্বদাই খাদ্যবিষ নামক (Ptomain) এক প্রকার ভয়ানক বিষের কথা শুনা যায়। খাদ্যের সহিত এই বিষ উদরস্থ করিয়া কত লোক প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। যে সকল জিনিসের যোগের ফল জানা নাই, তাহার যোগসাধন করিয়া অনেক সময় এইরূপ ফল ঘটিয়া থাকে। তাই বলিতেছিলাম, পরিচিত বিষযোগ ত্যাগ করিবে এবং অপরিচিত যোগও পরিত্যাগ করিবে। এ বিষয়ে পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, শাস্ত্র-শাসন, লোকাচার ও দেশাচার মানিয়া চলিলেই সুখী হইবে।

আহার সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলিবার আছে, এই খানে তাহা বলা ভাল। যেখানে সেখানে খাইবে না। অনেকে মনে করেন একত্র ভোজন না করিলে বন্ধুত্ব গাঢ় হয় না। ভালবাসাটা ভাসা ভাসা থাকিয়া যায়। ইহা বড় ভুল কথা। আমার অনেকগুলি খৃষ্টিয়ান ও মুসলমান বন্ধু আছেন। তাঁহাদের সহিত আমার বন্ধুত্ব যেরূপ বহুদিন ব্যাপী ও হৃদয়-স্পর্শী, এরূপ স্বধর্ম্মীর ভিতরও বড় কম। তাঁহারাও জানেন আমিও জানি যে, একত্র ভোজনক্রিয়া হইবার নহে। উহা একটা অসাধ্য বস্তুর মধ্যে পরিগণিত, সুতরাং তাঁহারাও তজ্জন্য দুঃখিত হন না, আমিও কখন কষ্ট বোধ করি না। ভিন্নধর্ম্মীর সহিত যেমন একত্র আহার নিষিদ্ধ, ভিন্নজাতীয় ও ভ্রষ্টাচারী লোকের সহিত আহারও তদ্রূপ ধর্ম্মশাস্ত্রে নিষিদ্ধ। এ সকল নিষেধ মানিতে হইবে। যদিই কোন ক্ষেত্রে তাহাতে বন্ধুত্বের হানি হয়, ধর্ম্মহানি অপেক্ষা সে বন্ধুত্ব হানি কিছু বেশী নয়, তাহা অকাতরে ত্যাগ করিবে। আমাদের একটা প্রবাদ বাক্য আছে "দুর্জ্জনের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য দেশত্যাগ করিবে; এবং আত্মার যেখানে অনিষ্টাশঙ্কা আছে সে অবস্থায় পৃথিবীত্যাগ করিবে!" আমাদের খাদ্যাখাদ্যের উপর ধর্ম্মনির্ভর করে এবং ধর্ম্ম আত্মার উন্নতিমূলক। আমাদের ধর্ম্মের এই সকল সূত্র বেশ মনে রাখিবে। আমাদের কোন কোন ধর্ম্মশাস্ত্রের নির্দ্দেশ যে, আমরা যাহা আহার করি, উহা আমাদের দেহাভ্যন্তরস্থিত আত্মার তর্পণ সাধন মাত্র। ইহা

পরম জ্ঞানের কথা; বয়োবৃদ্ধি সহকারে বুদ্ধিস্ফূর্ত্তি হইলে, এ সকল কথা বুঝিতে পারিবে। আহার সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইল, এখন এই পর্য্যন্তই ভাল।

আচমন—আহারের পর উত্তমরূপে পরিষ্কৃত জলে আচমন করিবে। আচমন অর্থে কেবল হস্ত ও মুখ প্রক্ষালন নহে। মুখ ত ভাল করিয়া পরিষ্কার করিতেই হইবে তৎসঙ্গে দুই হস্ত এবং পদদ্বয়ও ধৌত করা কর্ত্তব্য। প্রয়োজন বোধ করিলে দন্তকাষ্ঠ অর্থাৎ খড়িকা ব্যবহার করিবে। হস্ত পদ ও মুখ, প্রক্ষালনান্তর শুষ্ক বস্ত্রে মুছিয়া ফেলিবে। পরিধেয় বস্ত্রে হাত মুখ মুছা ভাল নয়; বস্ত্রান্তরে তাহা করা কর্ত্তব্য।

মুখশুদ্ধি—আহারান্তে এ দেশে মুখশুদ্ধি গ্রহণের নিয়ম আছে। ইহা ভারতের সর্ব্বত্র আছে কি না জানি না; কিন্তু এ রীতি আমাদের প্রদেশে বহুদিবসাবধি প্রচলিত আছে। এমন কি দেবতা ও পিতৃলোকদিগকেও তাম্বুল দিবার ব্যবস্থা আছে। তাম্বুল ব্যবহারের অনেক উপকারিতা আছে বলিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যাঁহারা ব্যবহার করেন তাঁহারা তাম্বুলের উপকারিতা বুঝিয়া ব্যবহার করেন, কি বিলাসের উপাদান বলিয়া ব্যবহার করেন, তাহা তাঁহারাই জানেন। মুখশুদ্ধির অর্থ বুঝি না। জল দ্বারা আচমন করিলে যে মুখ শুদ্ধ হয় না, তাহা আমি বুঝি না! জলে প্রক্ষালন করিলে সকল জিনিসই শুদ্ধ হয়। হস্তপদাদি উচ্ছিষ্ট সংযুক্ত হইলে

কেবল জলদ্বারা প্রক্ষালন করিয়া শুদ্ধ করা হয়। বস্ত্রাদি অশুচি হইলে জলে প্রক্ষালনই বিধি। জলের ন্যায় সহজ-শোধক দ্রব্য থাকিতে আবার অপর শোধনোপায়ের প্রয়োজন কি? তবে যদি নিতান্তই তাহাতে মনঃপূত না হয়, তাহা হইলে. আমার এক পূজনীয় আত্মীয় ছিলেন, তাঁহার দৃষ্টান্তানুসরণ করিতে পার। তিনি উত্তমরূপে মুখপ্রক্ষালনের পর, মন্ত্রোচ্চারণ ও ভগবানের নাম উচ্চারণ করিতেন। ধর্ম্মপ্রাণ লোকের ইহা বড় প্রশস্ত উপায়। মন্ত্রস্নান আছে, আর মুখশুদ্ধি মন্ত্রে হয় না কি? তোমার ইষ্টমন্ত্র হয় নাই, তবে গায়ত্রীদীক্ষা হইয়াছে, তবে নিতান্ত মুখশুদ্ধির আবশ্যক বোধ করিলে এতদুদ্দেশে একবার গায়ত্রী উচ্চারণ করিলেই যথেষ্ট হইবে। এত গেল মানসিক তৃপ্তির কথা, কিন্তু মুখশুদ্ধির ভান করিয়া নানা প্রকার সুগন্ধমশলাবিশিষ্ট খদিরচূর্ণকসম্বলিত পর্ণপত্রচর্ব্বণের সুখোপলব্ধিই অধিকাংশ স্থলে ঘটিয়া থাকে।

যাঁহারা তাম্বুল ব্যবহার করেন, তাঁহারা মানুন বা না মানুন ইহা যে বিলাসিতার উপকরণ, তাহা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেন। বিলাস, বিদ্যার্থীর জন্য নহে; ধর্ম্মার্থীর জন্য নহে, জ্ঞানার্থীর জন্যও নহে। আমাদের জীবনের লক্ষ্য কি তাহা সর্ব্বদা মনে রাখিয়া পানাহারাদি তদনুরূপ ও তৎসাহায্যকারী করা চাই। বিলাসিতা—বিদ্যা, ধর্ম্ম ও জ্ঞানের বিরোধী জিনিস। যিনি বিলাসিতায় মনোনিবেশ করিলেন, তাঁহার বিদ্যা স্থলে অবিদ্যা আসিয়া পড়ে, ধর্ম্মলাভ হয় না। আর বিদ্যালাভ ও ধর্ম্মসাধন

না হইলে জ্ঞান কোথা হইতে হইবে? তাম্বুল সেবন বড় একটা ব্যয়সাধ্য নহে, সেই জন্যই ইহাতে আমার বেশী আশঙ্কা। যে সকল জিনিস ব্যক্তিবিশেষের আপত্তিজনক অথচ অনায়াসে না হউক, স্বল্পয়াসলভ্য, সেই সকল জিনিসে আমি বড় ভয় পাই। তরলমতি যুবকের নিকট তাহারা কেমন আস্তে আস্তে প্রবেশ করে। অপকারিতা সহসা উপলব্ধি হয় না; ইহা আরও ভয়ের কথা। উৎকট দ্রব্য ব্যবহারের কুফল তৎক্ষণাৎ জানিতে পারা যায় সুতরাং সকলেই তাহাকে ভয় করে, কিন্তু যাহাদের অপকারিতা অল্পে অল্পে জন্মায় তাহাদের জন্য কেহ আশঙ্কিত নহে সুতরাং সেইগুলি বড় ভয়ানক। ইহারা মিষ্টভাষী শত্রু। বুদ্ধিমান লোকে ইহাদিগকে প্রবল শত্রু অপেক্ষা অধিক ভয় করেন। বলিতে পার, তাম্বুল যদি এত অপকারী জিনিস এবং ত্যজ্য, তবে দেবতাদের ও পিতৃলোককে দেওয়া হয় কেন? এটা বড় শক্ত কথা। আমরা দেবলোককে, পিতৃলোককে এমন অনেক জিনিস দিয়া থাকি যাহা আমরা নিজে ব্যবহার করিতে অসমর্থ। উপরে যে কথা বলিয়াছি তাহা যদি স্মরণ রাখ এবং বুঝিতে পারিয়া থাক তাহা হইলে উপস্থিত কথার তাৎপর্য্য বুঝা কঠিন হইবে না। তোমার এখন চাই কি? সকলই চাই, চাই বিদ্যা, ধর্ম্ম, জ্ঞান; তুমি তাহার জন্য প্রতিনিয়ত চেষ্টা করিতেছ, কত দিন করিবে তাহারও স্থিরতা নাই। তুমি যদি কর্ম্মফলে, চেষ্টার গুণে, সাধনার সাহায্যে বিদ্যা, ধর্ম্ম ও জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হও, তাহা হইলে তাম্বুল কেন, যাহা

কিছু বিলাসিতার উপকরণ সমস্তই অবাধে ব্যবহার করিতে পারিবে। তখন বিলাসিতা তোমার অন্তরায় হইবে না, তাহাতে স্পৃহাও থাকিবেনা। এমন প্রকৃত সাধুসন্ন্যাসী দুইএক জন দেখিয়াছি, যাঁহারা জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, ব্রহ্মজ্ঞান বলে তাঁহাদের কাছে এক বস্তু হইতে অপর বস্তুর পার্থক্য মাত্র নাই। সকলই তাঁহারা ব্রহ্মময় দেখেন। তখন তাঁহারা যাহা কিছু পান বা ভোজন করেন তাহাকেও সেই ব্রহ্মদর্শন করেন আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া মনে করেন, এবং পান বা ভোজন করা কেবল ব্রহ্মার্পণ মাত্র বোধ করেন। তাঁহারা নিজে কোন জিনিসের দোষগুণের বিষয় উপলব্ধি করেন না। আমরা এমন গল্প শুনিয়াছি, যে, এইরূপ কোন ব্রহ্মজ্ঞানপ্রাপ্ত সন্ন্যাসীকে নাকি কোন লোক উৎকট সুরাপান করাইয়া দেখিয়াছেন, যে সুরার অল্প পরিমাণ পান মাত্রে মানুষ উন্মত্ত হইয়া উঠে ও অল্প কাল পরে মৃতপ্রায়, হয়, তাহাই নাকি প্রচুর পরিমাণে পান করান সত্ত্বেও তাঁহার কোন প্রকার মানসিক বা দৈহিক বিকার লক্ষিত হয় নাই। একথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। তুমি পুরাণে পরমজ্ঞানী প্রহ্লাদের কথা পড়িয়াছ। তাঁহার পিতা অসুররাজ হিরণ্যকশিপু বিবিধ প্রকারে তাঁহাকে মারিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রহ্লাদের অপরাধ তিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ভগবান ভিন্ন আর কিছু জানিতেন না, মানিতেন না। দুষ্টচিত্ত ভগবদ্দেষ্টা অসুররাজের তাহা অসহ্য, কাজেই নিজ পুত্র হইলে কি হয়, প্রহ্লাদকে নিধনের

জন্য তিনি কত উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই সকল উপায়ের মধ্যে একটী উপায় করিয়াছিলেন—বিষ প্রয়োগ। প্রহ্লাদ অম্লান বদনে ভগবানে তাহা অর্পণ করিয়া নিজ বদনে তাঁহাকে আহুতি দিলেন। কোথায় সে কালকূট? কিছুই করিতে পারিল না। অপকার করিবে কাহার—যাহার কাছে ভালমন্দের বিলক্ষণ পার্থক্য। আর যাহার কাছে সমস্তই সমান, তাঁহার কাছে আর প্রভেদ কি? তবে এক কথা জিজ্ঞাসা করিতে পার যে দেবলোককে, পিতৃলোককে আমরা যে বিলাসিতার উপকরণ নিবেদন করি তাহা যদি মন্দ জিনিস তবে দিব কেন? না দেওয়াই ত ভাল। ইহার উত্তরে এক কথা স্মরণ রাখিবে, এই সকল দ্রব্য দেব ও পিতৃলোককে উৎসর্গ করা আমাদের ন্যায় সামাজিক লোকের জন্য ব্যবস্থা; পূর্ণ জ্ঞানীর জন্য নহে। অপর কথা, বয়োবৃদ্ধ পিতা যাহা যাহা করেন শিশুপুত্র তাহা করিতে সমর্থ নহে। অধিকারভেদে ভোগাদির তারতম্য অবশ্যই হইবে। আমরা মনে মনে বুঝি যে ভাল শয্যায় শয়ন করা বড় সুখপ্রদ, ভাল বস্ত্র পরিধান করা বড় প্রিয়, সুমিষ্ট পানাহার কত তৃপ্তিকর। কিন্তু নিজে আমরা কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাহা করি না। সে উদ্দেশ্য বিদ্যা, ধর্ম্ম, ও জ্ঞান লাভ। পাছে তাহাতে অন্তরায় হয় সেই জন্য আমরা বিলাসিতা চাই না। যাহারা ঐ ত্রিবিধ লাভ চায় না তাহারা বিলাসিতায় মজিয়া থাকে। তাহার ফলে হয়ত তাহারা কখনও বিদ্যা, ধর্ম্ম, জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে

না। এমনও হইতে পারে তাঁহারা জ্ঞানলাভ করিয়া বিলাস-ভোগ করিতেছেন, তখন ভোগ, অভোগ, সুখ, দুঃখ, তাহাদের কাছে সকলই সমান সুতরাং তাঁহাদের তাহাতে ক্ষতি নাই। এইরূপ নানারূপ যুক্তিদ্বারা উক্ত প্রথার কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। মোট কথা যতদিন তুমি বিদ্যাভ্যাস শেষ না কর এবং ধর্ম্মচর্চ্চা করিয়া জ্ঞানলাভ না কর, ততদিন তাম্বুল সেবন কেন, কোনরূপ বিলাসিতার প্রশ্রয় দিবে না।

অনেকস্থলে মুখশুদ্ধির জন্য যাঁহারা তাম্বুল ব্যবহারে অনিচ্ছুক, তাঁহারা তাহার অনুকল্প স্বরূপ সুপারি কি অন্য প্রকার মশলা, বা কেহ হরিতকী ব্যবহার করিয়া থাকেন। যদি মুখশুদ্ধির প্রয়োজনই না থাকে তাহা হইলে কিছুই দরকার নাই। মুখশুদ্ধি বলিয়া এই সকল জিনিস ব্যবহার করিয়া মুখবিবরকে অপরিষ্কৃত করা হয়, কতকগুলি আবর্জ্জনা যুক্ত করা হয়। আমার মতে আহারান্তে ভাল করিয়া পরিষ্কৃত জলে মুখ প্রক্ষালনান্তে কোন প্রকার মুখশুদ্ধিরই আবশ্যক নাই। তবে যদি কোন চিকিৎসক আহারান্তে কোন প্রকার বস্তু ব্যবহার করিতে ব্যবস্থা করেন তাহা রোগীর ঔষধ জ্ঞানে ব্যবহার করিবে। কিন্তু সাবধান, যেন কোন একটা জিনিস প্রত্যহ ব্যবহার করায় তাহাতে এমন অভ্যাস না হয় যে তাহা না পাইলে তাহার জন্য আকাঙ্ক্ষা বা কষ্ট হয়।

পরিচ্ছদ—তাহার পর বিদ্যালয়ে যাইবার পরিচ্ছদ পরিধান করিতে হইবে। পরিচ্ছদ সম্বন্ধে অনেক বিষয় বলিবার আছে। তুমি কখন শয্যাত্যাগ কর, অতি প্রত্যূষে কর, কি বিলম্বে কর, সন্ধ্যাপূজাদি কর কি না, আহারাদি কি কর, কি না কর, তাহার সহিত অপরের বড় একটা সম্পর্ক নাই। সমাজের যদিও এসকল দেখা কর্ত্তব্য এবং প্রত্যক্ষে না হউক পরোক্ষভাবে তাহা দেখিয়া থাকেন, কিন্তু পরিচ্ছদ সম্বন্ধে সমাজ প্রত্যক্ষ সমালোচক। সেই জন্য সেক্ষপিয়রের জ্ঞানী বৃদ্ধ পলোনিয়স্ ঠিকই বলিয়াছেন "পোষাকেই মানুষ বুঝা যায়।" যখন সমাজ পোষাক দেখিয়াই তোমাকে বুঝিবেন, তখন তৎসম্বন্ধে তোমার খুব বিবেচনা করিয়া চলা আবশ্যক। এখনও তুমি বিদ্যালয়ের, ছাত্র এখন পোষাক সম্বন্ধে বড় একটা কিছু ধর্ত্তব্য নহে, তবে এখন হইতে যেরূপ অভ্যাস করিবে, এখন লোক পোষাক দ্বারা তোমাকে যেরূপ ধারণা করিবে চিরদিনই তোমাকে সেই ভাবে দেখিবে। সুতরাং এখন হইতে পোষাক সম্বন্ধে একটু সাবধান হওয়া দরকার। পরিচ্ছদ সম্বন্ধে একটা মোটা কথা বলিয়া রাখি, ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। এমন পরিচ্ছদ পরিধান করিবে যে লোকে কোন প্রকার সমালোচনা করিবার অবসর না পায়। বিশেষ ভাল মন্দ কিছুই বলিবার না থাকে, পোষাক সম্বন্ধে আমার ধারণা, ভাল বলিয়া প্রশংসাটাও অপবাদ। যে পোষাক লোকের মনোযোগ আকৃষ্ট করিল, লোকে অন্ততঃ ভাল বলিয়াও সমালোচনা করিল, তাহার ন্যায় সরলতা কোথায়?

কখন কখন সরলতার ভাণ করিয়া অনেকে আত্মাভিমান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। সেটা বড় ঘৃণার ও লজ্জার কথা। সাবধান, যেন সরলতার দেবীমূর্ত্তির অন্তরালে অভিমানের পিশাচমূর্ত্তি অবস্থান না করে। যাঁহার যেমন অবস্থা, তাঁহার সেইরূপ পরিচ্ছদ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। যাঁহার যে কার্য্য করিতে হয় তিনি তদনুরূপ পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া যাইতেছেন। তুমিও তাহাই করিবে। সমাজে পাঁচজনের একজন হওয়া চাই। লোকাতীত গুণ ও চরিত্র বড় প্রশংসনীয়। কিন্তু লোকাতীত সাজ সরঞ্জাম বড় ঘৃণিত জিনিস। মনে কর কোন সভায় বা কার্য্যস্থলে সকলকে কোন এক বিষয় পরিধেয় ধারণ করিয়া যাইতে হইবে, যদি কেহ নিজের বিদ্যাবুদ্ধির গৌরব বা ধনাভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া নিজ পদমর্য্যাদা দেখাইবার জন্য তদপেক্ষা আড়ম্বর পূর্ণ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া যান তাহা হইলে সকলের নিকট তাঁহার আত্মাভিমান প্রকাশ করা হয় না কি? তিনি যেন স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দিতেছেন যে তোমরা সকলে যে নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া পোষাক পরিয়া আসিয়াছ আমি নিজগুণে বা গৌরবে তাহার বশবর্ত্তী নহি, আমি তোমাদের হইতে পৃথক, উচ্চতর লোক। এ ভাবটা মনে আসে না কি? সমাজকে প্রভূত মান্য করিয়া চলিতে হইবে। সমাজকে তাচ্ছিল্য করা একটা সামাজিক মহাপাপ। পরিধেয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া আবশ্যক কিন্তু তাহাতে কোনরূপ জাঁক জমক থাকিবে না এবং

সাধারণ হইতে হীনও হইবে না। উপরে যাহা বলিয়াছি তাহা হইতে অবশ্য বুঝিয়াছ যে পরিচ্ছদের হীনতাও স্থান বিশেষে পরিচ্ছদের না হউক মানুষের জাকজমক প্রকাশ করে। পাঁচ জনে যেমন পোষাক পরেন, বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ যেমন ভালবাসেন বা বিদ্যালয়ের যদি কিছু নিয়ম থাকে, তোমার পোষাক ঠিক তদনুরূপ হওয়া চাই। ছাত্রজীবনের অনেক আচার ব্যবহার সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবনের উপর কার্য্যকরী হয়। পোষাক সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করিয়া চলা চাই। যদি বল এখন লেখাপড়া করিবার সময়, পরিচ্ছদ সম্বন্ধে এত চিন্তা করিবার অবকাশ কোথায়? তাহার উত্তর, বিশেষ কিছু চিন্তা না করিলেই সাধারণ আচারের সহিত তোমার পার্থক্য থাকিবে না, সকলে যাহা করে অন্ততঃ অধিকাংশ লোক যাহা করে, তাহা করিলেই নিশ্চিন্তভাবে কার্য্য করিতে পার। চিন্তা করিয়াই লোকে বিভ্রাট ঘটায়, এ বিষয়ে যত ভাবনা কম থাকিবে ততই সুবিধা।

একশ্রেণীর যুবক আছেন তাঁহারা যাহার কিছু সৌখীন দেখেন, যাহা কিছু জাঁক জমক, বা চাল চটক দেখেন, তাহাই নিজে ব্যবহার করিবার চেষ্টা করেন, বোধ হয় তাঁহাদের সেই বিষয়েই সর্ব্বদা চিন্তা আছে। যাহার যে বিষয় চিন্তা যেরূপ, তাঁহার তাহাতে সিদ্ধিও তদ্রূপই হইয়া থাকে। পোষাকটা অনুকরণসাপেক্ষ। কিন্তু কাহার অনুকরণ করিবে? সমাজের সাধারণ লোকের অনুকরণ করিবে। পাঁচজনের অনুকরণ

করিবে। দশজনের ভিতর দুই একজন যাহা করে তাহা অনুকরণীয় নহে, তবে যখন দেখিবে দশজনের মধ্যে অর্দ্ধেকের অধিক সংখ্যক লোক অর্থাৎ ছয় সাত জন লোক পরিচ্ছদ সম্বন্ধে একটা কিছু নূতন প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন বা করিতেছেন তখন তুমিও তাঁহাদের অনুগামী হইবে। কখন পরিচ্ছদ সম্বন্ধে অগ্রগামী হইবে না। "মুখরস্বস্ত্র হন্যতে" কথাটা পোষাকে যতদূর প্রয়োগ্য এত আর কোথাও নহে। পূর্ব্বে সাধারণতঃ আমাদের দেশে কামিজের এত ব্যবহার ছিল না। যাঁহারা কোট বা চাপকান পরিতেন তাঁহারাই কেবল তাহার নীচে কামিজ ব্যবহার করিতেন। তাহাও সকলে নহে। অপর সাধারণ লোকে ধূতি চাদরের সহিত কামিজ ব্যবহার না করিয়া হস্তে বোতামবিহীন এক রকম জামা ব্যবহার করিতেন। কিন্তু গত ২০।২৫ বৎসরের ভিতর এই শেষোক্ত প্রকার জামা এক প্রকার বিরল প্রচার হইয়াছে। পোষাকের দোকানে সচরাচর এখন আর তাহা পাওয়া যায় না, কাজেই তাহার ব্যবহার উঠিয়া গিয়াছে। এক্ষণে যখন সাধারণ লোকে ধূতি চাদরের সহিত কামিজ ব্যবহার করিতেছেন তখন সাবেক "পিরাণ" ব্যবহার করিলে অসামাজিক ব্যবহার বলিতে হইবে। একটা নূতন ব্যবহারের দৃষ্টান্ত—ভদ্রলোকের ভিতর রেশমের চাদর ব্যবহার। ১৮৮৪ সালে আমি একজন ভদ্রলোককে প্রথম সূতার ধূতি ও জামার সহিত

গরদের চাদর ব্যবহার করিতে দেখি। দেখিয়া একটু নূতন বলিয়া মনে হইল বটে কিন্তু বড় সুবিধাজনক ও মনে হইল। ধনী লোকের পক্ষে না হউক, সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে সুবিধাজনক বটে। যেমন মূল্য একটু বেশি তেমন একখানি গরদের চাদর পাঁচখানি সূতার চাদরের কাজ করিয়া থাকে। এ বিষয়ে ব্যয় বাহুল্য নহে অথচ আর এক দিকে খুব সুবিধা। কাপড় ও চাদর একরূপ পরিষ্কার থাকা সভ্য সমাজোচিত ব্যবহার, কিন্তু ধুতি যত শীঘ্র ময়লা হয় চাদর তত হয় না, আর সাধারণ গৃহস্থলোক একবার পরিয়া ধুতি চাদর রজকগৃহে প্রেরণ করিতেও সমর্থ নহে, সুতরাং তাঁহাদের ধুতি চাদরের সামঞ্জস্য রক্ষা করা বড় কঠিন, কিন্তু রেশমের চাদর ব্যবহার করিলে সেজন্য কোন চিন্তা করিতে হয় না। এই জন্য বলিতে-ছিলাম ধনী লোকের পক্ষে না হউক গৃহস্থের পক্ষে রেশমের চাদর ব্যবহার করা প্রথাটা মন্দ নয়। তাই বোধ হয় এই গত কয় বৎসরে ইহার ব্যবহার খুব বাড়িয়াছে। এখন যখন ইহার ব্যবহার এত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, ইহা করিতে কোন দোষ নাই। কিন্তু সেই ১৮৮৪ সালে প্রথম যখন সেই ভদ্রলোককে ইহা ব্যবহার করিতে দেখি, তখন ইহা আমার বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, আমার ন্যায় বোধ হয় অনেকেরই তাঁহার উপর দৃষ্টি পড়িয়াছিল। এই জন্যই বলিতেছিলাম

পোষাক সম্বন্ধে পাঁচজনে যখন যাহা করিবে তখন সেইমতই তুমি করিবে কিন্তু সেই পাঁচজন, কাহাকে লইয়া গণনা করিতে হইবে, তাহাও বিবেচ্য বিষয়। তোমার সমকক্ষ, একরূপ অবস্থাপন্ন, একরূপ ভাবাপন্ন পাঁচ জন হওয়া চাই। পাঁচজন ইংরাজের ছেলে যে পোষাক পরিবেন, সে পোষাক তোমার নহে। হয়ত এই পাঁচজন সাহেবের ছেলে বা সাহেবভাবাপন্ন লোকের ছেলে তোমার সহাধ্যায়ী বন্ধু। তাঁহারা তোমার সহাধ্যায়ী হইলেও নিশ্চয় তোমার সমভাবাপন্ন নহেন, সুতরাং তাঁহাদের পরিচ্ছদ তোমার অনুকরণীয় নহে। আবার হয়ত তোমার সহাধ্যায়ীগণের মধ্যে পাঁচজন ধনীপুত্র থাকিতে পারেন, তাঁহাদের শরীরে যে পোষাক শোভা পায়, তোমার তাহাও অনুকরণীয় নহে। ধনীলোকের অনুকরণ সাধারণ গৃহস্থের ছেলেদের করিতে যাওয়া অপেক্ষা অনিষ্টকর আর কিছুই নাই। একজন সামান্য ধনীলোক ছিলেন, তাঁহার কিন্তু ধারণা ছিল তিনি এ প্রদেশের ধনীদের মধ্যে একজন প্রধান লোক। যখন যে দরবারে কিংবা অপর সাধারণ ধনীলোকের গম্যস্থানে যাইতেন, অপরাপর তাঁহার অপেক্ষা অধিকতর ধনীলোকের পোষাক পরিচ্ছদ ও আসবাবের প্রতি দৃষ্টি করিতেন, এবং বাটীতে আসিয়াই কাহারও মত পাগড়ী, কাহারও মত পোষাক, কাহারও মত গাড়ীঘোড়ার সাজ, কাহারও মত সহিস্ কোচম্যানের পোষাক প্রস্তুত

করাইবার আদেশ হইত। এই করিয়া তিনি অল্পকাল মধ্যে বিষম ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়িলেন এবং যদিও তাঁহার হঠাৎ অকাল মৃত্যু হইল, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুকালে তিনি যে দেনা রাখিয়া যান, তাহাতে তাঁহার ত্যক্ত সম্পত্তির অধিকাংশ দায়গ্রস্ত করিয়া শোধ ভিন্ন উপায়ান্তর ছিল না। ইহাতে দাঁড়কাক ও ময়ূর-পুচ্ছের গল্প মনে পড়ে না কি? যে যেমন তাহার তেমন চলা চাই। সমঅবস্থাপন্ন, সমভাবাপন্ন লোকের ন্যায় চাল চলন, পোষাক পরিচ্ছদ করাই বিধেয়।

পরিচ্ছদ সম্বন্ধে স্বাধীনতা কিছু মাত্র নাই। অবস্থাভেদে পোষাক সম্বন্ধে সকলেই বিধি নিষেধের দাস। কোন বিধি নিষেধের দাসত্ব ঘৃণার জিনিষ নয়, বরং তাহা না মানা অন্যায় ও ঘৃণার্হ। মধ্যে মেডিকেল কলেজের একজন অধ্যক্ষ নিয়ম করেন যে তাঁহার বিদ্যালয়ে সকল বিদ্যার্থীকে মোজা ও কোট পরিতে হইবে। তিনি প্রধান শিক্ষক, তাঁহার আদেশ সকলেরই অবশ্য প্রতিপাল্য এবং পালিত হইয়াও আসিতেছে। ছাত্র জীবনে বরং এ সম্বন্ধে স্বাধীনতার কথা উঠিতে পারে কিন্তু যাহাদের বৃত্তি বা ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া পাঁচজনের সহিত একত্র মিলিয়া মিশিয়া কার্য্যকরিতে হইবে, তাঁহাদের স্বাধীনতা চলেনা। তাহা স্বাধীনতাই নহে, বরং স্বেচ্ছাচারিতা বলিলেই ভাল হয়। বাস্তবিকই অনেক সময়ে অনেক অপরিণত-বুদ্ধি যুবক কোন্‌টা স্বাধীনতা ও কোন্‌টা স্বেচ্ছাচারিতা প্রভেদ

করিতে সমর্থ হন না, অনেক সময়েই স্বাধীনতার দেবীমূর্ত্তির স্থলে ভ্রম ক্রমে স্বেচ্ছাচারিতার রাক্ষসী মূর্ত্তির সেবা করিয়া থাকেন। সে বিষয়ে তাঁহাদের সর্ব্বদা সাবধান হওয়া উচিত। নিয়ম বা বিধি ব্যবস্থার অধীনতা দাসত্ব নহে, বিশৃঙ্খল ভাবই বরং দাসত্বের লক্ষণ, ঠিক দাসত্বের লক্ষণ না হইলেও স্বেচ্ছা-চারিতার লক্ষণ ত বটেই। নিয়ম ও বিধির অধীন হইয়া কত শত বড় লোককে, বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, পদস্থ গৌরবান্বিত লোককে—কত সময়ে কত সাজে সাজিতে হইতেছে। তাহাতে তাঁহাদের লজ্জার কথা কিছুই নাই বরং সে বিধি মান্য করিয়া চলা তাঁহাদের শ্লাঘার বিষয় সন্দেহ নাই।

পরিচ্ছদ সম্বন্ধে শেষ কথা—পরিচ্ছদের উপর কোন একটা স্পৃহা থাকিবে না। পরিচ্ছদ সামাজিক নিয়মানুসারে করিতে হয় বলিয়া করা। ইহা একটা নৈসর্গিক অভাব দূর করিবার জন্য নহে, কেবল সামাজিক নিয়ম পালনের জন্য মাত্র, তাহা যেন সর্ব্বদা মনে থাকে। যাঁহারা সামাজিক নহেন, সমাজে বাস করেন না, তাঁহাদিগের কোন পরিচ্ছদেরই আবশ্যকতা নাই। জ্ঞানীরও নাই। জ্ঞানহীনেরও নাই। অসভ্য বর্ব্বর, যাহারা এখনও ভাল করিয়া সমাজ-বদ্ধ হইতে শিখে নাই, যাহাদের ভিতর সামাজিক কোন নিয়ম এখনও বিধি বদ্ধ হয় নাই, তাহারা হয়ত উন্নত সমাজের লোক অপেক্ষাও কোন কোন বিষয়ে উন্নত হইতে পারে, কিন্তু তাহারা পরিচ্ছদের আবশ্যকতা বুঝে নাই। আবার এমন

জ্ঞানী লোক অনেক আছেন যাঁহাদের বসন থাকা না থাকা সমান। আমরা এমন দুই এক জনকেও দেখিয়াছি। আমরা সামাজিক নিয়মানুসারে যাহাকে লজ্জানিবারণ করা বলি, ইঁহারা সে ভাবের ধার ধারেন না। ইঁহারা সমাজের ভিতর বাস করেন না, সমাজের নিয়ম ও মানেন না। তবে সামাজিক লোকের সংঘর্ষে আসিলে অগত্যা অন্যের জন্য নিজের আবশ্যক না থাকিলেও বসনে অন্ততঃ দেহের কিয়দংশও আবৃত করিতে হয়। এটুকুও তাঁহাদের সামাজিক লোকের সংস্পর্শে আসা রূপ পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ। এতদ্বারা যতদূর বুঝা যায় একবারে অজ্ঞান ও পূর্ণ-জ্ঞানী পরিচ্ছদ সম্বন্ধে উভয়েরই অবস্থা প্রায় একরূপ। উভয়েই সমাজ জানেন না, বা মানেন না, বলিয়া সামাজিক লোকের ন্যায় পরিচ্ছদের আবশ্যকতা অনুধাবন করেন না। পোষাক পরিচ্ছদ যখন সমাজের জন্য, সমাজ শাসনের বশবর্ত্তী হইয়া যতটুকু না করিলে নয় ততটুকুই আবশ্যক জ্ঞান করিতে হইবে। ভোজন যেমন একটা নৈসর্গিক অভাব দূর করিবার জন্য, বসনও সেইরূপ একটা সামাজিক নিয়ম পালন জন্য। আহার বিষযে যেমন ক্ষুন্নিবৃত্তি মাত্রই ভোজনের উদ্দেশ্য হওয়া চাই, পরিচ্ছদ সম্বন্ধে তেমনি সামাজিক নিয়ম পালন করিতে যতটুকু দরকার ততটুকু করা চাই। আহার সম্বন্ধে অভাবের উপর যাহা, তাহাকে যেমন লোলুপতা বা পেটুকতা বলে, পরিচ্ছদ সম্বন্ধেও তেমনি সামাজিক

নিয়মাধীনে যাহা করা আবশ্যক তাহা অপেক্ষা অধিক করার নাম বিলাসিতা বা বাবুগিরি। ভাল লোকের পক্ষে আহারের লোলুপতা ও পরিচ্ছদে বিলাসিতা সমানই ঘৃণার্হ ও ত্যজ্য।

বিদ্যালয়—এইভাবে পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া বিদ্যালয়ে যাইবে। সর্ব্বদাই একটু সময় থাকিতে যাইবে। অধ্যাপক আসিবার অন্ততঃ পাঁচ মিনিট পূর্ব্বে গিয়া যথাস্থানে উপবেশন করিয়া. পথশ্রান্তি দূর করিবে। পরে অধ্যাপক আসিলে তাঁহার নিকট শিক্ষা লাভ করিবে। বিদ্যালয়ের পড়াশুনা সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার নাই, সে বিষয়ে যথাযথ উপদেশ দিবার ভার অধ্যাপক মহাশয়গণের উপর। প্রকৃত পক্ষে তাঁহারা দয়া করিয়া আমার সে ভার গ্রহণ করিয়া আমাকে বড়ই উপকৃত করিয়াছেন। সে জন্য তোমার অধ্যাপক মহাশয়গণের নিকট আমি যে কত কৃতজ্ঞ তাহা বলিয়া শেষ করিবার নহে। আমার বোধ হয় ছাত্রগণের অভিভাবকগণ সকলেই এইরূপ পুত্রগণের অধ্যাপকদিগের নিকট চিরকৃতজ্ঞ। বিদ্যালয়ে গিয়া যেরূপ আচরণ করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। প্রথম কথা শিক্ষকগণের প্রতি ব্যবহার। শিক্ষকগণের প্রতি সর্ব্বদা খুব ভক্তি প্রদর্শন করিবে। তাঁহারা বৃদ্ধই হউন, আর যুবাই হউন, সকলেই পিতৃস্থানীয়। সকলেরই প্রতি তদ্রূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। আমাদের সমাজে গুরুভক্তি

চিরপ্রসিদ্ধ; যাঁহার নিকট কখন কোন একটা ভাল জিনিস শিখিয়াছ বা কোনরূপ সৎশিক্ষা লাভ করিয়াছ, তিনিই তোমার গুরু। তাঁহার প্রতি কি বিদ্যালয়ে, কি বাহিরে, সর্ব্বদা গুরুভক্তি প্রদর্শন করিবে। তাহাতে তাঁহার প্রীতি জন্মিবে, তোমারও মঙ্গল হইবে। গুরুশিষ্য ভক্তি ও স্নেহ না থাকিলে শিক্ষা ফলবতী হয় না। গুরুবাক্য অলঙ্ঘনীয়। তাঁহারা যাহা যাহা বলিবেন, তাহা প্রতিপালন করিতে হইবে। যদি কখন তাঁহাদের কোন আদেশ অযথা বলিয়া তোমার বোধ হয়, প্রথমতঃ সে ধারণা ভ্রমাত্মক, শিক্ষক যাহা বলিয়াছেন তাহাই ঠিক বলিয়া মান্য করিবে। তবুও যদি শিক্ষকের কোনবাক্যের যাথার্থ্যাবধারণ করিতে অসমর্থ হও, তাহা হইলে তাঁহার অবকাশ কালে, অতি বিনীতভাবে গিয়া তাঁহার নিকট দণ্ডায়মান হইয়া যথাবিহিত সম্মান জ্ঞাপনান্তে সে কথা নিবেদন করিবে। তাহা হইলে যদি তোমার ভ্রম হইয়া থাকে তাহার অপনোদ হইবে, আর যদি দৈবক্রমে তাঁহারই কোন প্রকার ভ্রম হইয়া থাকে তাহা হইলে তিনিও তাহা সংশোধনের অবসর পাইবেন। কখনও তাঁহাদের কোন কথার প্রতিবাদ করিবে না, ভ্রম করিতেছেন দেখিলেও তাহাতে তৎক্ষণাৎ কোন কথা কহিবে না। গুরুলোকের দোষ দেখান উচিত নহে। “দোষাঃ বাচ্যাঃ গুরোরপি” কথাটার প্রকৃত অর্থগ্রহণ করিতে না পারিয়া অনেক সময় বিপরীত ফল হইয়া থাকে। ইহা

কেবল সত্যের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনের পরাকাষ্ঠা দেখাইবার জন্য। সত্য এমনই অভীপ্সিত জিনিস যে শত্রুর গুণ থাকিলেও বলিতে হইবে এবং গুরুর যদি কিছু দোষ থাকে তাহাও গোপন করিয়া সত্যের অপলাপ করা শাস্ত্রনিষিদ্ধ। ইহাতে বরং ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে গুরুর দোষোদ্ঘাটন কর্ত্তব্য নহে, তবে যেখানে না বলিলে সত্য হইতে বিচ্যুত হইতে হয় সেইখানে সত্য পালন জন্য গুরুর দোষ বলা চলে, অন্যত্র নহে। অনেক সময় এমন ঘটে যে গুরুলোকের কোন একটি কথা বা আচরণ অন্যায় বা ভ্রান্ত বলিয়া মনে হয়, কিন্তু তাহা বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে পরে বুঝা যায় যে সেটা তাঁহাদের দোষ বা ভ্রম নয়। আমার নিজ জীবনেই এমন ঘটিয়াছে। বাল্যে আমার পিতৃদেব যিনি পূর্ণজ্ঞানী ছিলেন, তাঁহার দুই একটি ব্যবহারে আমার কেমন একটু খটকা লাগিত, মনে হইত হয় ত তিনি ভ্রম করিতেছেন। তখন তিনি পরিণত বয়স্ক, জ্ঞানবান, আর আমি অপরিণত বয়স্ক ও জ্ঞানহীন; আমি কোন কথা বলিতে বা তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিতে সাহসী হইতাম না, কিন্তু মনে মনে একটু একটু সন্দেহ থাকিত। পরে যখন আমার বয়োবৃদ্ধিসহকারে ও অপর নানা কারণে জ্ঞান না হউক একটু অভিজ্ঞতা জন্মিল, তখন বুঝিতে পারিলাম তিনি যাহা করিতেন তাহাই অভ্রান্ত, আমি পূর্ব্বে যাহা বুঝিতাম তাহা নিতান্ত

ভ্রমাত্মক। সেই জন্য বলিতেছি যে সহসা গুরুলোকের কার্য্যে বা ব্যবহারে দোষ দর্শন করা বা তাঁহাদের কার্য্য ভ্রম বলিয়া মনে করা যুবকের পক্ষে নিতান্ত ধৃষ্টতা; তাহাতে অনেক সময় নানারূপ অপকার ঘটিয়া থাকে। সে জন্য সে বিষয়ে তোমাকে একটু সাবধান করিয়া দেওয়া ভাল। নিজের অপরিণত বুদ্ধির উপর বড় একটা বেশি নির্ভর বা বিশ্বাস করিবে না।

গুরুর সহিত যখনই সাক্ষাৎ হইবে তখনই তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিতে হইবে। যাঁহাকে আমাদের সামাজিক নিয়মানুসারে প্রণাম করা চলে তাঁহাকে প্রণাম করিবে আর যাহার প্রতি তাহা না চলে, তাঁহার সহিত তিনি যাহাতে সম্মানিত জ্ঞান করিবেন সেই মত ব্যবহার করিতে হইবে। অনেক সময় এমন ঘটে তুমি হয়ত কোন অধ্যাপককে সম্মানাভিবাদন করিলে, তিনি তাহা উপেক্ষা করিয়া প্রত্যভিবাদন করিলেন না। তাহাতে বিরক্ত বা দুঃখিত হইবে না। তুমি প্রত্যভিবাদন জন্য তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিবে না, তুমি তোমার কর্ত্তব্য বোধে তাহা করিবে এবং তোমার কর্ত্তব্য তুমি করিয়াছ ইহাতেই তুমি সন্তুষ্ট থাকিবে। তিনি প্রত্যভিবাদন না করাতে তোমার অসন্তোষের কারণ নাই। আর এক কথা মানুষ মানুষের হৃদয় দেখিতে পায় না। হয় ত তোমার সম্মান দেখানকালে তোমার শিক্ষক তোমাকে মনে মনে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন,

প্রকাশ্যে কোন ভাব প্রকাশ করা হয়ত তাঁহার অভ্যস্ত নহে। তাহাতে তোমার মঙ্গল হইবে। তাঁহারও তোমার প্রতি ভালবাসা বাড়িবে। গুরুশিষ্যে সমকক্ষভাব যেন কখন কোন কালে মনে হয় না। গুরু চিরকালই উচ্চস্থান অধিকার করিবেন, সম্মানিত হইবেন। কখন এক আসনে অথবা সম আসনে বসিবে না। এক পংক্তিতে কোন কারণে থাকিবে না। সর্ব্বদাই পশ্চাতে আসন গ্রহণ করিবে। তবে যদি তিনি নিতান্ত অনুরোধ করেন তাহা হইলে তাঁহার আদিষ্ট স্থানে বসিবে। এস্থলে একটি প্রবাদবাক্য সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। আমরা ব্রহ্মা অপেক্ষা বেদের সম্মান বেশি করি। ব্রহ্মার মুখ নিঃসৃত বেদ, ব্রহ্মা অপেক্ষা আমাদের সম্মানের জিনিষ। সেইরূপ অনেক স্থলে গুরুর অপেক্ষা গুরুর আদেশ গুরুতর অর্থাৎ তাঁহার আদেশ সর্ব্বাগ্রে প্রতিপাল্য, তাহাতেই তাঁহাদের প্রীতি সুতরাং তাহাই করা চাই। গুরুর সম্মুখে কখন প্রগল্‌ভতা বা বাক্-চাতুর্য্য দেখাইবে না। বেশি বাক্যপ্রয়োগ করা নম্রতাসূচক নহে। কোন কথা স্পৃষ্ট হইলে তাহারই উত্তর দিবে, সেই উত্তরটা খুব বিনয়ের সহিত দেওয়া উচিত। তাহাতে যেন ঔদ্ধত্যের লেশমাত্রও না থাকে। আর অপৃষ্ট হইয়া কোন কথাই কহিবে না। যদি গুরু ও শিষ্য কোন সভাস্থলে আহূত হন, গুরুর বিনা আদেশে শিষ্যের কোন কথা বলা উচিত নহে। নিতান্ত বাধ্য হইয়া বলিতে

হয় সে কথা পৃথক। গুরু, শিক্ষক, অধ্যাপক প্রভৃতি একপর্য্যায় ভুক্ত। যিনি কখনও শিক্ষা দিয়াছেন বা যাঁহার নিকট কখনও কোন উপদেশ পাইয়াছ তিনি চিরদিনই তোমার গুরু। এ সম্বন্ধে একজন পরম শ্রদ্ধাস্পদ চিন্তাশীল ব্যক্তির একটি বড় উপদেশপ্রদ কথা স্মরণ হইতেছে। তিনি একদিন, একটি দোকানে বসিয়া আছেন এমন সময় একজন ভদ্রবংশের অসৎ লোক তাঁহার সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতেছেন, দেখিয়া তিনি তাঁহাকে সসম্মানে "প্রভু, প্রণাম হই" বলিয়া প্রণাম করিলেন। সকলেই আশ্চর্য্য। পরিণত বয়স্ক জ্ঞানবান শিক্ষক মহাশয় সেই অপরিণত বয়স্ক বিপথগামী যুবককে এত সম্মান দেখাইলেন কেন? এই যুবক এই ঘটনার অল্পদিন পূর্ব্বে কোন অপরাধে দণ্ডিত হইয়া কারাবাস হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে। শিক্ষকমহাশয় সকলকে গম্ভীর স্বরে বলিলেন, উনি যদি প্রভু না হন তবে প্রভু কে, উনি আমাদিগের শিক্ষাগুরু, মহাপ্রভু, উঁহার নিকট আমরা কি কার্য্যের কি ফল ইহা শিক্ষালাভ করিলাম, সুতরাং উনি আমার, তোমার ও প্রতিবাসিবর্গের সকলেরই উপদেষ্টা গুরু। উঁহাকে প্রভু বলিয়া প্রণাম না করিলে চলিবে কেন? অপর ঐ ব্যক্তি সম্বন্ধে তিনি এক কথা বলিয়াছিলেন তাহা উপস্থিত বক্তব্য বিষয় সম্বন্ধে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও কথাটা ভাল বলিয়া বলিতেছি। তিনি বলিলেন উহাকে তোমরা

ঘৃণা কর কেন? উনি যে অপরাধে অপরাধী সেরূপ অপরাধ কি আর কেহ করে না। আপনার ভিতর অন্বেষণ করিলে অনেকেই জানিতে পারিবেন অনেকেই ঐরূপ দোষে দোষী। তবে ঐ ব্যক্তির দোষ প্রকাশ হইয়াছে, প্রমাণ হইয়াছে, সকলে জানিতে পারিয়াছে এই মাত্র প্রভেদ। ফলে কিন্তু অনেক প্রভেদ, ঐ ব্যক্তি তাহার কৃত দোষের জন্য রাজদণ্ড ভোগ করিয়াছে। উহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। উনি এক্ষণে নিষ্পাপ হইয়াছেন। কিন্তু যাহাদের দোষ প্রকাশ হয় নাই, তাহাদের পাপ রহিয়াছে, কবে তাহাদের, দণ্ড হইবে বলা যায় না। ক্রমে তাহাদের পাপের ভার বাড়িতে চলিতেছে, তাহার উপর তাহারা সমাজকে, আপনারা নির্দোষ বলিয়া প্রকাশ করায়, একরূপ প্রতারণাও করিতেছে সুতরাং তাহারা বিবিধ রকমে সমাজের নিকট দোষী তাহাদের পাপের সীমা নাই। তাহাদের সহিত তুলনায় ঐ কারামুক্ত ভদ্রলোকের ছেলে সহস্রগুণে বিশুদ্ধ, নিষ্পাপ নয় কি? যে কথার জন্য এই গল্পের অবতারণা তাহা, আমার প্রাচীন শিক্ষক মহাশয়ের গুরুভক্তি প্রকাশ। তিনি বড়ই চিন্তাশীল, সূক্ষ্মদর্শী লোক ছিলেন। এ প্রকার সাধারণ লোকে হইবে বলিয়া প্রত্যাশা কয়া যায় না। অন্ততঃ যাহাকে আমারা সাধারণতঃ শিক্ষা বলি, সেই শিক্ষা যাঁহার যাঁহার নিকট পাইয়াছ পাইতেছ বা পাইবে, সকলকেই তোমার শিক্ষক বা গুরু জ্ঞান করিবে। তাঁহার সহিত চিরদিনই সসম্মান ব্যবহার

করিবে। যদি কখন তুমি তাঁহাদের ভিতর কাহারও অপেক্ষা অধিক শিক্ষিত বা জ্ঞানী হইতে পার, তাহা তাঁহারই প্রাথমিক সৎশিক্ষার গুণে ও আশীর্ব্বাদে, একথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে।

আজ কয়েক দিন হইল এক শোক সভায় একজন বিশ্ব বিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ যুবকের প্রগল্‌ভতা দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হইয়াছি। সভাস্থলে যুবকের পিতা, মাতুল, শিক্ষক এবং বহু পিতৃবন্ধু ও পিতারও সম্মানিত বিদ্বান, বুদ্ধিমান বৃদ্ধ উপস্থিত ছিলেন। যুবক স্বয়ং প্রবৃত্ত হইয়া মৃত মহাত্মার জীবন ও চরিত্র হইতে আমরা কত সৎ শিক্ষা পাইতে পারি তাহা বর্ণনা করিয়া সকলকে তাহা অনুকরণ করিতে উপদেশ দিলেন। কথা যে কিছু মন্দ বলিলেন তাহা নহে। তবে যে স্থলে তাঁহার বহুসংখ্যক গুরুলোক সমুপস্থিত, যাঁহাদের নিকট তিনি উক্তরূপ শিক্ষালাভ করিয়াছেন এবং এখন ইচ্ছা করিলে বহু কাল করিতে পারেন, তাঁহাদিগকে উপদেশ দেওয়া, এমন কি তাঁহাদের সাক্ষাতে বক্তা অপেক্ষা অল্প বয়স্ক বালক দিগকে উপদেশ দেওয়াও, বাচালতা ও প্রগল্‌ভতা বলিয়া মনে হইল। এইরূপ গুরুলোকের সাক্ষাতে কখন কাহারও শিক্ষকের স্থান অধিকার করিবে না।

এই যে শিক্ষক বা অধ্যাপকগণকে এত সম্মান ও ভক্তি করিতে বলিতেছি, মনে করিও না ইহার কোন ভাবী উপকারিতা নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ

হওয়া ও উপাধি গ্রহণ করা এ জীবনের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য নহে। এই সকল শিক্ষকের নিকট ভাষাতত্ত্ব, পদার্থ তত্ত্ব, নীতি তত্ত্ব প্রভৃতি যে সকল পার্থিব বিষয়ে শিক্ষা লাভ কর, তাহা শিক্ষার প্রথম ও অধস্তন স্তর মাত্র। এই সকল শিক্ষা কিয়ৎ পরিমাণে লাভ করিয়া সকলেরই উৎকৃষ্ট বিদ্যা অর্থাৎ যে বিদ্যা বলে আমরা ভগবানের তত্ত্ব জানিতে পারিয়া মোক্ষলাভ করিতে পারি সেই ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিবার চেষ্টা করা আমাদের কর্ত্তব্য। চিরদিনই আমাদের দেশে তাহাই রীতি ছিল। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ সেইরূপ করিয়া ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা আপনা হইতে হয় না, তাহাতে গুরু চাই। বিনা শিক্ষকের সাহায্যে সহজে বিদ্যা লাভ করা যায় না। এই পরা বা ব্রহ্মবিদ্যাদাতা গুরুকে আমরা প্রকৃত গুরুপদ বাচ্য বলিয়া মনে করি। এই গুরুকে ব্রহ্মের সাকার মূর্ত্তিরূপে ভাবিতে হইবে। গুরুর বাক্যই সত্য আর সমস্তই জগতে অসত্য। এতটা গুরুর উপর নির্ভর না করিলে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হয় না। কিন্তু হঠাৎ গুরুর প্রতি এ প্রকার একান্ত ভক্তি ও নির্ভরতা কি প্রকারে জন্মিতে পারে? সেই জন্য এই জড় জগতের সামান্য বিষয়ের যাঁহারা শিক্ষা দেন সেই সকল গুরুর প্রতি ভক্তি ও নির্ভরভাব অগ্রে অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। সুতরাং এই সকল গুরু, শিক্ষক বা অধ্যাপকগণকে ভক্তি, ও তাঁহাদের

উপর নির্ভর করিতে শিক্ষা করা ব্রহ্মবিদ্যালাভের অর্থাৎ সামান্য কথায় আমাদের জীবনের প্রধান ও প্রকৃষ্ট উদ্দেশ্যের উত্তর সাধক।

অতএব এই সকল শিক্ষক ও উপদেষ্টাগণকে ভক্তি শ্রদ্ধা করায় তোমার ঐহিক পারত্রিক উভয়বিধ উপকারের সম্ভাবনা এমন উপায়কে উপেক্ষা করা কোন মতে, কর্ত্তব্য নহে। পূর্ব্বে একটা প্রবাদ বাক্য ছিল, যে তিন প্রকারে বিদ্যালাভ হয়, তাহার প্রথম ও প্রধান উপায় গুরু শুশ্রূষা, দ্বিতীয় উপায় গুরুকে প্রচুর অর্থ দান করা, তৃতীয় বা শেষ উপায় বিদ্যার বিনিময় সাধন করিয়া বিদ্যোপার্জ্জন করা! গুরু শুশ্রূষা আজকাল একেবারেই উঠিয়া গিয়াছে; এখন শুশ্রূষার স্থানে যথাযোগ্য ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিলেই যথেষ্ট হইবে। প্রচুর অর্থদান কয়জন করিতে পারেন? সাধারণ বিদ্যালয়ে পাঁচজনের সঙ্গে বিদ্যাভ্যাসই এখনকার রীতি হইয়াছে। সুতরাং দুই এক স্থলে পুষ্কল ধন দ্বারা বিদ্যাভ্যাসের চেষ্টা থাকিলেও সাধারণতঃ তাহা ঘটিয়া উঠে না। বিনিময় লব্ধ বিদ্যাতে উভয়ে উভয়ের গুরু। যেখানে বিনিময়ের ভাব সেখানেই যেন ভক্তিশ্রদ্ধার কথা উঠে না। সেখানে ব্যবসাদারের ভাব গুরু-শিষ্যের ভাব নহে। আমাদের দুইজন বন্ধু আছেন, একজন হিন্দু ও অপর মুসলমান। যিনি হিন্দু তিনি মুসলমানকে সংস্কৃত পড়াইতেন এবং মৌলবী সাহেব হিন্দুকে পারশি

পড়াইতেন। এইরূপে তাঁহারা বিদ্যার বিনিময় করিতেন। তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের সহিত বন্ধুত্বে আবদ্ধ ছিলেন। তাঁহাদিগের ভিতর গুরু শিষ্যের ভাব আদৌ জন্মে নাই, তবে বন্ধুত্ব বেশ জন্মিয়াছিল। অর্থাৎ বিনিময়ে যে ভাবের উন্মেষ হয় তাহা সাম্য ভাব, তাহাতে উভয়ের ভিতর সম্বন্ধ স্থাপন হয়। এই তিন উপায়ে বিদ্যালাভ এক্ষণে সাধারণতঃ অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। কিঞ্চিৎ ধনদান বাকিটুকু ভক্তি ও সম্মান দ্বারা পূরণ করিয়া গুরুর নিকট হইতে বিদ্যালাভ করাই এখনকার দিনে সম্ভবপর ও প্রকৃষ্ট উপায়।

সমপাঠিগণের সহিত ব্যবহার। বিদ্যালয়ে গিয়া শিক্ষক ছাড়া আর এক শ্রেণীর লোকের সহিত তোমাদিগকে মিশিতে হয়। ইহাদের সহিত তোমাদের সম্পর্ক বড় ঘনিষ্ঠ। ইহারা তোমার সমপাঠী। ইহারা সকলেই ভ্রাতৃস্থানীয়। ইহাদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিবে। যাহারা তোমার অপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন, তাঁহাদিগকে জ্যেষ্ঠ সহোদরের ন্যায় সম্মান করিবে ও ভাল বাসিবে। যাহারা একত্র অধ্যয়ন করেন তাঁহাদিগকে ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বোধ করিবে। ইহাদের সহিত সহৃদয়তা সহকারে ব্যবহার করিবে। খুব নিজের লোক বোধ করিবে। লেখা পড়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্ত্বেও সর্ব্বদা ইহাদের মঙ্গল কামনা করিবে। ইহাদের আত্মীয়গণকেও আত্মীয় বোধ করিবে। আর যাহারা তোমার অপেক্ষা কম পড়ে তাহাদিগকে কনিষ্ঠ সহোদরের ন্যায় ভাল

বাসিবে, তাহাদের যাহাতে ভাল হয় তার চেষ্টা করিবে। গোপনে তাহাদিগকে সদুপদেশ দিবে। কখনও মনে করিও না যে, যে কয়দিন তোমরা বিদ্যালয়ে আছ, ইহাদিগের সহিত তোমার সেই কয়দিনের সম্পর্ক মাত্র। এই সম্পর্ক বহুদূর ব্যাপী ও বহুকাল স্থায়ী। বিদ্যালয়ের সমপাঠীদের সহিত শিক্ষাকালে যে সদ্ভাব স্থাপিত হয়, তাহা অনেক সময় মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়, কখন পুরুষ পরম্পরা ক্রমে চলিয়া থাকে। এই সকল সহাধ্যায়িগণের সহিত ব্যবহার সম্বন্ধে একটি কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। এই যে সকল বিদ্যার্থী তোমরা একত্র একস্থানে অধ্যয়ন করিতেছ কালে সকলে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পদবীতে উপনীত হইবে। এখন যাহার সহিত, এবং সকলের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিবে, প্রত্যেকে চিরদিন তাহা স্মরণ করিয়া রাখিবে। যদি কাহারও সহিত কোন মন্দ ব্যবহার কর, তাহা হইলে আজীবন তিনি তোমাকে সেই মন্দ ভাবে স্মরণ করিয়া রাখিবেন। পরে তুমি তাহার সহিত, সমাজের সহিত যতই কেন সদ্ব্যবহার কর না, সেই যে কবে তুমি বিদ্যালয়ে তাঁহার সহিত অন্যায় ব্যবহার করিয়াছিলে তাহাই তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া থাকিবে। তিনি চিরদিনই সেই ভাব হৃদয়ে পোষণ করিবেন। হয়ত তোমার কথা পড়িলে তিনি লোকের কাছে সেই কথা গল্প করিবেন। কোন দুরভিসন্ধি না থাকিলেও তোমার সেই অসদ্ব্যবহারের কথা তিনি কথা উপস্থিত হইলেই বলিবেন। এইরূপে বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া যখন

দশজন দশদিকে যাইবে, তখন সেই ধারণা সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে। তোমার ভবিষ্যতের ব্যবহার যতই ভাল হউক না কেন, সেই বিদ্যালয়ের ব্যবহারানুসারেই তাঁহাদিগের নিকট, তাঁহাদের আত্মীয় বন্ধুগণের নিকট, তাঁহাদের পুত্র-কন্যাদির নিকট পরিচিত হইবে। অতএব এক্ষণে খুব সাবধান, যেন কোন প্রকার কুব্যবহার কাহারও সহিত না করা হয়। এই সদ্ব্যবহার কেবল ব্যক্তিগত নহে, সাধারণতঃ সকলের নিকট বিনীত, নম্র, সহৃদয় হওয়া চাই।

কাহারও কোন প্রকার তোমার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিবার না থাকে। স্বভাব চরিত্র গঠনের সময়ে বিদ্যালয়ে যেরূপ দেখাইবে, তুমি সেইরূপ স্বভাবচরিত্রের লোক বলিয়া সমাজে পরিচিত হইবে। বিদ্যালয়ের যাহারা তোমার অপেক্ষা অধিক পড়েন তাঁহাদের নিকট হইতে মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের সুবিধা মত পাঠাভ্যাস সম্বন্ধে সাহায্য গ্রহণ করিবে। এবং যাঁহারা তোমার অপেক্ষা কম পড়েন বা কম বুঝেন তাঁহারা তোমার নিকট বিদ্যা-ভ্যাস সম্বন্ধে যখন যে ভাবে সাহায্য প্রার্থী হইবেন সেই ভাবে সাহায্য করিবে। তাহাতে নিজের একটু ক্ষতি স্বীকার করিতে হয় সে ক্ষতিকে ক্ষতি বোধ করিবে না, ফলে তাহাতে তোমার মহান্ লাভ হইবে। এমন অনেক সময় ঘটে যে তোমার পার্শ্বস্থ ছাত্র হয়ত স্বল্পদৃষ্টিমান, অধ্যাপক কৃষ্ণবর্ণ কাষ্ঠ ফলকে যে চিত্র অঙ্কিত করিয়া কোন একটা সূত্র বুঝাইতেছেন, তিনি সে চিত্র দেখিতে না পাওয়ায় ভাল করিয়া বুঝিতেছেন না।

সেরূপ অবস্থায় তুমি তাঁহার খাতায় তাঁহাকে সেই চিত্রটি আঁকিয়া দিলে তাঁহার বুঝিবার সুবিধা হইবে, প্রত্যক্ষে তাঁহার একটি উপকার করিলে, আবার পরোক্ষে তুমি তোমার অধ্যাপকের চিত্রের অনুকরণে তৎক্ষণাৎ আর একটি চিত্র অঙ্কিত করিয়া তোমার শিক্ষার পক্ষেও সুবিধা হইল। হয় ত নূতন একজন অধ্যাপক আসিয়াছেন, তাঁহার উচ্চারণ তুমি বেশ বুঝিতে পারিতেছ কিন্তু তোমার সহাধ্যায়ী কেহ কেহ ভাল বুঝিতে পারিতেছেন না, অথচ শীলতা রক্ষার জন্য সে কথা কেহ প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না, সে ক্ষেত্রে অবসর কালে তুমি তোমার বন্ধু সমক্ষে অধ্যাপক মহাশয় যাহা যাহা বলিয়াছেন তাহা আবৃত্তি করিলে তাঁহাদের সাহায্যের সঙ্গে সঙ্গে তোমারও বিদ্যাভ্যাসের সৌকার্য্য হইবে। এরূপভাবে সহাধ্যায়িগণের সাহায্যকারী হইতে কখন কুণ্ঠিত হইবে না। তোমার অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান, তীব্র-মেধা ছাত্রের প্রতি কখন ঈর্ষা করিবে না। সতীর্থদের ভিতর এই ঈর্ষা ভাবটা বড়ই ঘৃণিত। ইহা কিন্তু নূতন নহে। উত্তরচরিতে বাসন্তী ও আত্রেয়ী নাম্নী মহর্ষি বাল্মীকির দুই ছাত্রীর মুখে কবি ভবভূতি ও লব কুশের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও তাহাদের উভয়ের প্রতি গুরুর পক্ষপাতিত্বের উল্লেখ করিয়াছেন। সেটা নাটককারের লব কুশের চরিত্রোন্মেষ জন্যই হউক, আর যে কারণেই হউক, ভবভূতি সৃষ্টি করিয়া ছাত্রীদ্বয়কে একটু খাট করিয়াছেন। অধিকন্তু তাঁহাদের পীড়া হইলে সাধ্যমত সেবা করিবে,

কোন বিষয়ের অভাব হইলে, তোমার যতদূর সাধ্যায়ত্ত সে অভাব দূর করিবার চেষ্টা করিবে। পূর্ব্বে সহাধ্যায়িগণের মধ্যে সৌহার্দ্দ এত অধিক ছিল, যে সকলেই সকলকে নিজ পরিবারভুক্ত বলিয়া মনে করিতেন। আমার পূজ্যপাদ জ্যেষ্ঠসোদরপ্রতিম পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত তারা-কুমার কবিরত্ন মহাশয় তাঁহাদের পঠদ্দশায় গ্রীষ্মাবকাশে দূর দেশবাসী যে সকল ছাত্র বাটী না গিয়া কলিকাতায় থাকি-তেন তাঁহারা সকলে কিরূপ আনন্দ সহকারে তাঁহাদের কোদালিয়ার বাটীতে গিয়া অবকাশ কাটাইতেন তাহার গল্প করেন ও পূর্ব্বস্মৃতিজনিত আনন্দ অনুভব করেন। সকলেই তাঁহার জননীকে মা বলিয়া ডাকিতেন এবং অকৃত্রিম মাতৃ-স্নেহানুভব করিতেন। এরূপ পবিত্র আনন্দ ভোগ করা ছাত্র-জীবনেই সম্ভবপর। ইহা বড় আনন্দপ্রদ ভবিষ্যভাব। ইহাতে হৃদয়ে হৃদয়ে যে পবিত্র প্রণয়ে আবদ্ধ হয়, ভাবী জীবনের দুরূহ সংগ্রামেও তাহা কিছুতেই বিচ্ছিন্ন হইবার নহে। পরে হয়ত বিষয়কর্ম্ম সম্বন্ধে বিরোধী ভাব আসিয়া উপস্থিত হইয়া উভয়ের মধ্যে অশান্তি আনয়ন করিতে পারে অন্ততঃ বাহ্যিক দৃষ্টিতে সেইরূপ বোধ হইতে পারে, কিন্তু ছাত্র-জীবনে যদি প্রণয় বদ্ধমূল হইয়া থাকে তাহা হইলে সেই ঘোর সাংসারিক সংঘর্ষের অন্তস্তলে প্রণয়ের শান্তিময় প্রস্রবণ প্রবাহিত হইয়া জীবনকে,—সংসারকে আনন্দময় করিয়া তুলিবে। এইরূপ সুখশান্তির বীজ কিন্তু রোপণ

করিবার সময় এই ছাত্র-জীবন। এখন না করিলে ইহার পর আর হইবে না। সতীর্থগণের ভিতর কেহ কখন তোমার অসন্তোষজনক কার্য্য করিলে তোমার তাহা সহ্য করিতে হইবে তজ্জন্য তাহার উপর ক্রোধ করিবে না, প্রতিহিংসার কথা কখন ও মনে আনিবে না। কেহ তোমার প্রতি কোনরূপ অসদ্ব্যবহার করিলে, তুমি তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিবে তিনি সেরূপ আর না করেন, তাহাতে ও তিনি প্রতিনিবৃত্ত না হন, সাধারণ বন্ধু অর্থাৎ তোমার ও তাঁহার উভয়েরই যিনি বন্ধু এমত লোকের নিকট সে কথা বলিবে, যে তাঁহার মধ্যস্থতায় তোমার মনো-মালিন্য অপনীত হয়, তাহাতেও কৃতকার্য্য না হও, তাঁহার সংসর্গ ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ কিন্তু কোনও কারণে তাঁহার বিরুদ্ধে শিক্ষক বা অধ্যক্ষকে কিছু বলিবে না। এইরূপ অভিযোগ করাটা বড় দোষের কথা, ইহাকে আমি বড় ঘৃণা করি বিদ্যালয়ের এই সামান্য অভিযোগ সংসারের ঘোরতর গোলযোগের অগ্রসূচী মাত্র। সহ্য করিতে, উপেক্ষা করিতে, নত হইতে, অবশেষে ত্যাগ স্বীকার করিতে এখন হইতে শিক্ষা করা উচিত। এখন তোমাদের হৃদয় কোমল, অন্তর পবিত্র আছে, এখন যদি ইহা শিক্ষা না কর সংসারের ঘোর স্বার্থপর আবর্ত্তনে পড়িয়া কোথায় ডুবিয়া যাইবে, তোমার স্বভাব চরিত্র আচার ব্যবহার, বিদ্যাবুদ্ধি অতল জলে ডুবিয়া যাইবে অতএব এই ছাত্রজীবনে বালজীবনের খেলাঘরের মত এই সকল সৎপ্রবৃত্তি যাহাতে উন্মেষ হয় তাহা করা চাই।

সময়ে সময়ে দুর্ভাগ্যবশতঃ অনেক বিদ্যালয়ে ছাত্র ও শিক্ষকগণের বিবাদ হইয়া থাকে। তোমাদের বিদ্যালয়ে যে কখন হয় নাই বা হইবে না তাহা সম্ভব নহে। সে ক্ষেত্রে কি করিবে? এরূপ ঘটনা ও শিক্ষার একটি আদর্শ স্থল। পূর্ব্বে অনেক বার বলিয়াছি, শিক্ষক গুরু অভ্রান্ত, তিনি কিছু অন্যায় করিতে পারেন না, ছাত্রগণ তাঁহার অভিপ্রায় উপলব্ধি করিতে না পারিয়া অনেক সময় হিতে বিপরীত করিয়া ফেলে। উভয় পক্ষের অভিপ্রায় উভয়কে শান্তভাবে অবকাশ মত বুঝাইয়া দিলে, অনায়াসে শান্তি স্থাপিত হইতে পারিবে। এইরূপ অবস্থায় ধীর ভাবে মধ্যস্থতা করিবার চেষ্টা করিবে, অথচ তুমি দশের এক জনই থাকিবে, সহাধ্যায়িগণ হইতে আপনাকে পৃথক বিবেচনা করিবে না। তাহাদের সঙ্গে থাকিয়া ক্রমে ক্রমে শিক্ষক মহাশয়ের সদভিপ্রায় বুঝাইয়া দিবে। এরূপ ব্যবহারে উভয়ের সৌহার্দ্দ অবিচলিত থাকে এবং শিক্ষক মহাশয়ের প্রতি ছাত্রগণের ভক্তি ও তাহাদের প্রতি শিক্ষক মহাশয়ের প্রীতি অক্ষুণ্ণ থাকে। তাহা হইলে তোমার আনন্দানুভূতি হইবে। এই ভাব লইয়া সংসারে অবতীর্ণ হইলে সমাজের যে কত দূর উপকার সাধন করিতে পারিবে, পরে দেখিতে পাইবে। যাঁহারা সংসারে শান্তির চেষ্টা করেন, ভগবান তাঁহাদিগের মঙ্গল করেন।

বিদ্যালয়ের কর্ম্মচারী। বিদ্যালয়ের অপর এক শ্রেণীর লোকের সংস্পর্শে তোমাদিগের সর্ব্বদাই আসিতে হয়।

ইহাঁরা শিক্ষক ও নহেন, সহাধ্যায়ী ও নহেন। ইহাঁরা বিদ্যালয়ের কর্ম্মচারী। ইহাঁদিগকেও যথেষ্ট ভক্তি করিবে, ইহাঁরাও তোমার শ্রদ্ধার পাত্র। বিদ্যালয়কে যদি পিতার ন্যায় ভক্তি করিতে শিখিয়া থাক, তাহা হইলে বিদ্যালয়ের যাঁহারা পরিচর্য্যায় নিরত তাঁহাদিগকে অবশ্যই পিতার পুরাতন কর্ম্মচারিদের যে ভাবে ব্যবহার করিতে হয় সেই ভাবে সম্মানের সহিত, শ্রদ্ধার সহিত, ভালবাসার সহিত ব্যবহার করা উচিত নয় কি? বাটীতে কি করিয়া থাক, আমার পুরাতন কর্ম্মচারিগণকে চিরদিনই তোমরা জ্যেষ্ঠভ্রাতা সম্বোধন করিয়া থাক, ভয় কর, ভক্তি কর, ভালবাস। বিদ্যালয়ের কর্ম্মচারিদিগকেও সেইরূপ ব্যবহার করিবে। এখনও করিবে, চিরদিনই করিবে। এ সম্বন্ধে আমার একটী বাল্যের স্মৃতি মনে আসিতেছে। আমার পিতৃদেবের সহিত সময়ে সময়ে আমি হালিসহরে বেড়াইতে যাইতাম। মধ্যে মধ্যে হালিসহরের একজন তৎকালের প্রাচীন অধিবাসী ৺রামধন গাঙ্গুলি মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইত। পিতা ঠাকুর মহাশয় তাঁহাকে প্রণাম করিতেন, আমাকেও প্রণাম করিতে বলিতেন। প্রথমতঃ আমার ধারণা ছিল, গাঙ্গুলি মহাশয় পিতা ঠাকুর মহাশয়ের অন্যতম অধ্যাপক, কিন্তু গাঙ্গুলি মহাশয়কে অধ্যাপকের মত কিছুই দেখাইত না। মনে বড় খটকা হইত, কিন্তু সে খটকা বেশি দিন স্থায়ী হয় নাই; পরে শুনিলাম তিনি সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব

কেরাণী ছিলেন। * কেরাণীর প্রতি পিতৃদেবের এত ভক্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইতাম, তখন হইতে কিন্তু সেই ভাবে আমিও বিদ্যালয়ের কর্ম্মচারিগণের সহিত ব্যবহার করিতে শিখিলাম। কথা প্রসঙ্গে মনে পড়িতেছে উক্ত গাঙ্গুলি মহাশয়ের শ্রাদ্ধোপলক্ষে অনেক বড় বড় পণ্ডিত হালিসহরে গিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে পরম শ্রদ্ধাস্পদ স্বর্গীয় পণ্ডিত প্রবর গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, যদুনাথ তর্করত্ন, রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রভৃতি কয়েক মহোদয় আমাদের বাটীতে অবস্থিতি করিয়া আমাদের কুটীর পবিত্র করিয়াছিলেন। এত বড় বড় পণ্ডিত কেবল স্বর্গীয় গাঙ্গুলি মহাশয়ের প্রতি ভক্তি প্রণোদিত হইয়াই শ্রাদ্ধোপলক্ষে হালিসহরে গমন করিয়াছিলেন। শ্রাদ্ধের বিষয় আলোচ্য নহে।

যে কথা পূর্ব্বে বলিতেছিলাম বিদ্যালয়ের কর্ম্মচারিদিগের প্রতি ও এইরূপ ব্যবহার করা চাই। অধ্যয়ন কালে অর্থাৎ যতদিন বিদ্যাভ্যাসে রত থাকিবে, একাগ্রভাবে তাহাতে মনোযোগী হইবে। অনন্যমনা হইয়া কোন কার্য্য না করিলে সে কার্য্যে কখন সফল মনস্কাম হওয়া যায় না। এই যে শত শত যুবক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছেন, সেই

* ৺রামধন গাঙ্গুলি মহাশয় অবসর গ্রহণ করার পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ৺কালীচরণ গাঙ্গুলি মহাশয় বহুদিন উক্ত কর্য্যা করেন এবং পরে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত ননীলাল গাঙ্গুলি এক্ষণে সংস্কৃত কলেজে কেরাণীগিরি করিতেছেন।

একই অধ্যাপক একই ভাবে সকলকে শিক্ষা দিতেছেন, কেবল চিত্তের একাগ্রতা না থাকায় অনেকে সে শিক্ষার ফল লাভ করিতে পারে না। এ সম্বন্ধে আরও এক কথা, বিদ্যাভ্যাস কালে, অন্য কোন বিষয়ে কোন মতে মনোযোগ দিবে না। পারিবারিক, সাংসারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এমন কি ধর্ম্ম সম্বন্ধেও কোন বিষয়ে মনোযোগ দিবে না; শিক্ষিতব্য বিষয়ই তোমার একমাত্র পাঠ্য এবং চিন্তার বিষয় হওয়া চাই, তাহার সাহায্যার্থ যে সকল পুস্তকাদি অধ্যয়ন করিতে হয় শিক্ষকের উপদেশানুসারে তৎসমুদায় যতদূর সাধ্য অধ্যয়ন ও আয়ত্তাধীন করিবে।

সংবাদ পত্র পাঠ। আজকাল অনেক যুবাকে বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ হইবার অগ্রেই, খবরের কাগজ পড়িতে দেখিতে পাই। উহাতে আমার আপত্তি আছে। সংবাদ পত্র পাঠ করিলে উপস্থিত সময়ের অনেক সংবাদ সংগ্রহ হয় মাত্র, তাহাতে বিদ্যাচর্চ্চা বাড়ে না, শিক্ষিতব্য বিষয়ের কিছুই সহায়তা করে না। বরং তাহার পরিবর্ত্তে যে সকল সাময়িক পত্রিকায় সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ থাকে তাহা পড়িলে উপকার হয়। সংবাদ পত্রে যে সকল লিখিত ও আলোচিত হয়, তাহা ছাত্র জীবনে না জানিলে কোন ক্ষতি নাই, বরং না জানাই ভাল। মনে কর পৃথিবীর কোন একটি স্থানে বড়ই অন্নকষ্ট হইয়াছে, দলে দলে লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতেছে, তুমি

এখন বিদ্যালয়ের ছাত্র, তোমার এমন কিছু আর্থিক সামর্থ্য নাই যে তুমি তাহাদের অন্নকষ্ট নিবারণ করিতে পার অথবা তোমার এমন সময় নাই যে তুমি তাহাদের অন্নকষ্ট ও অকাল মৃত্যু নিবারণ জন্য কোন উপায় উদ্ভাবন ও তৎপক্ষে চেষ্টা করিতে পার, যদি তাহা করিতে যাও তাহা হইলে তোমার বিদ্যাশিক্ষার বিষম বিঘ্ন ঘটিবে। লেখা পড়া ত্যাগ করিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। এরূপ ঘটনা অনেক ঘটিয়াছে। সেই জন্য বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ সংবাদ পত্র পাঠ যেন না করেন। যদি বল নিজের জন্য সাময়িক সংবাদ রাখা আবশ্যক; সে ভারটা অভিভাবকের উপর ন্যস্ত করিলে ভাল হয়। ছাত্রগণের কিসে ভাল হইবে বিদ্যালয়ে শিক্ষক মহাশয়গণ এবং বাটীতে অভিভাবকগণ দিবানিশি ভাবিতেছেন। তোমাদের অপরিণত বুদ্ধিতে ভাবিয়া তাহার অপেক্ষা বেশি কিছু হইবে না। শিক্ষক গণের উপর এবং অভিভাবক বর্গের উপর এইরূপ সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করিতে শিক্ষা করিতে হইবে। উপস্থিত সংবাদ লইয়া তোমার দরকার কি? বিলাতের মহাসভায় স্থিতিশীল বা উন্নতিশীল কোন্ দল প্রধান, এখানকার শাসনকর্ত্তাগণ কি প্রণালীতে রাজ্যশাসন করিতেছেন, সে বিষয়ে এক্ষণে তোমাদের মস্তিষ্ক আলোড়িত না করাই ভাল। সংবাদ পত্রে এই সকল রাজনৈতিক বিষয়ে যে ভাবে সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হয় তাহা পাঠ করিয়া

অনেক সময় মন অস্থির হইয়া উঠে, অথচ তাহার কোন উপায় করিতে পারিবে না।

রাজনৈতিক আন্দোলন—অনর্থক মন চঞ্চল করিয়া নিজ কর্ত্তব্যের হানি করার আবশ্যক কি? রাজনৈতিক বিষয়ে কি সংবাদ পত্র পাঠে, কি সভা সমিতিতে যোগদান, কোন দিকে কোন সংস্পর্শ রাখিবে না। অনর্থক সময় নষ্ট ও মন চঞ্চল করা মাত্র। তাহাতে তোমার পাঠের সমূহ ব্যাঘাত ঘটিবে, উহা সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিবে। রাজা আছেন, রাজ প্রতিনিধি আছেন, প্রধান শাসন কর্ত্তাগণ আছেন, প্রধান বিচারালয় আছে, শান্তিরক্ষার বন্দোবস্ত আছে, তাহার উপর আমাদের দেশের চিন্তাশীল শিক্ষিত মহানুভব দেশভক্ত ব্যক্তিগণ আছেন, ইহাঁরা সকলে তোমাদের মঙ্গল জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত আছেন, তাহাতে তুমি এখন কিছুদিনের জন্য সে ভার তাঁহাদের উপর ন্যস্ত করিয়া নিজে নিশ্চিন্ত মনে পড়াশুনা করিলে, বিদ্যাভ্যাসের সুবিধা হইবে। নচেৎ দুইদিকই নষ্ট হইবে। অনেক অপরিণত বয়স্ক যুবক অর্দ্ধ শিক্ষিত অবস্থায় রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিয়া তাহাদের নিজের এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে দেশের অনেক অনিষ্ট করিয়াছেন, সুতরাং রাজনৈতিক আন্দোলন ও তদ্বিষয় পাঠ হইতে দূরে থাকিবে। রাজনীতি পাঠে কোন দোষ আছে, আমি তাহা বলি না। বিদ্যালয়ে, সমাজ নীতি, অর্থনীতি, ব্যবহারনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি পাঠ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। তাহা অধ্যয়ন করিয়া তৎসম্বন্ধে যে জ্ঞান

হইবে তাহা ভাবিকালে কার্য্যে প্রযুক্ত হইয়া অনেক সুফল প্রসব করিবে। রাজনীতি অপরাপর নীতির ন্যায় শিক্ষা সম্বন্ধে বিরোধী নহে। তবে আমার মত, যতদিন বিদ্যার্থী থাকিবে দেশের উপস্থিত রাজনীতি সম্বন্ধে কিছুমাত্র চিন্তা করিবে না, আন্দোলন করিবে না। রাজনৈতিক আন্দোলন ভাল কি মন্দ তাহা সাধারণ ভাবে কিছু বলিতেছিনা। কেবল ছাত্রদের সম্বন্ধে নিষেধ করিতেছি মাত্র। যখন বিদ্যাভ্যাস শেষ হইবে, নিজে সংসার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে, নিজ বিদ্যা বুদ্ধি অনুসারে কার্য্য করিতে শিখিবে, তখন নিজ কর্ত্তব্য স্থির করিবে এবং রাজনৈতিক আন্দোলন ভাল বলিয়া মনে হয় করিবে। সময় ও অবস্থার উপর সকলই নির্ভর করে। এক সময় যাহা নিষিদ্ধ হয় সময়ান্তরে তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়ায়। এক অবস্থায় যে নিয়ম প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য, অবস্থান্তরে তাহা হয়ত প্রতিপাল্য না হইতে পারে। সংসারের নিয়মই এই।

সামাজিক আন্দোলন—রাজনৈতিক অপেক্ষা সামাজিক বিষয়ে মনোযোগ দিলে বিদ্যাভ্যাসের পক্ষে আরও ব্যাঘাত ঘটে। এখন তোমরা সমাজের লোক নহ। সমাজের সহিত তোমাদের এখন সাক্ষাৎ পক্ষে কোন সম্বন্ধ হয় নাই। বিদ্যাভ্যাসরত লোক চিরদিনই অসামাজিক হইয়া থাকেন। “অসামাজিক” আমি কোন মন্দ অর্থে বলিতেছি না। সমাজের সহিত সম্পর্ক রাখিতে গেলে লেখাপড়া হইয়া উঠা কঠিন।

সমাজ আছেন তোমাদের অভিভাবকগণ আছেন। তাঁহারা যাহা ভাল বুঝিতেছেন তাহাই ভাল, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা কর্ত্তব্য সামাজিক কথা রাজনীতি অপেক্ষাও কঠিন। সামাজিক বিষয় ভাবিতে হইলে আর সকল বিষয়ে জলাঞ্জলি দিতে হইবে, লেখা পড়া ছাড়িতে হইবে। আমাকে একবার একজন সন্ন্যাসী বলিয়াছিলেন তোমাদের গার্হস্থ্য বড় শক্ত আশ্রম, আমাদের সন্ন্যাসাশ্রমের এক মাত্র চিন্তা, তোমাদের চিন্তা বহুমুখী, ইহাতে চিত্ত স্থির রাখা বড় কঠিন। যথার্থ স্থির প্রকৃতি না হইলে, ভগবানে একান্ত ভক্তি না থাকিলে, গার্হস্থ্য কর্ত্তব্য সমাধা করা ভার। গার্হস্থ্যের প্রধান কর্ত্তব্য নিজ পরিবারের জনকয়েক লইয়া নহে, সমাজরূপ বৃহৎ পরিবার লইয়াই গৃহস্থের সমস্যা। সামাজিক কোন বিষয়ে কথা উপস্থিত হইলে তৎ সম্বন্ধে অনেক দেখিতে হয়, অনেক শুনিতে হয়, অনেক ভাবিতে হয়। তাহার জন্য তোমার এক্ষণে সময় কোথায়? সুতরাং সে কথায় এক্ষণে কর্ণপাত না করাই ভাল। আরও এক কথা সামাজিক কোন কথা ভাবিয়া তুমি এক্ষণে এক প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে, কিন্তু তাহাই কি অভ্রান্ত? তোমার এক্ষণে বিদ্যা পুস্তকস্থ, বুদ্ধি অপরিপক্ক, দৃষ্টি সীমাবদ্ধ, অভিজ্ঞতা জন্মে নাই। সমাজতত্ত্ব পর্য্যালোচনা কর নাই, দেশের লোককে চেন নাই, এখন তুমি যে সিদ্ধান্ত ঠিক করিবে, কালে বুদ্ধি একটু পরিপক্ক হইলে, দূর দৃষ্টি জন্মিলে, অভিজ্ঞতার ফলে তখন ভিন্ন সিদ্ধান্ত হয়ত করিবে। অনেক সময়ে তাহাই ঘটিয়া থাকে। উপস্থিত

হয়ত কোন সমাজ সংস্কারকের মনোমোহিনী বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া তাঁহার উদ্দীপনায় মন উত্তেজিত হইয়া তাঁহার যুক্তিগুলির আপাত সুন্দরতা বুঝিয়া তাঁহার মতানুসারে নিজে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে। কিন্তু ভবিষ্যতে তাহা যে ঠিক নয় তাহা হয়ত দেখিতে পাইবে। এই সকল সমাজ সংস্কারগণকে, বিশেষতঃ যাঁহারা সমাজ সংস্কারের জন্য বক্তৃতা করিয়া বেড়ান, তাঁহাদিগকে আমি বড় ভয় করি। তাঁহারা সমাজের অনিষ্ট ছাড়া যে ইষ্ট করিতেছেন আমার সে ধারণা নাই। তাঁহারা একদেশদর্শী বাক্যাবলী দ্বারা অপরিণত বয়স্ক যুবকদিগের মতিভ্রম সহজে উৎপাদন করেন। হয়ত ঠিক কথাই বলিতেছেন কিন্তু তাঁহাদের উত্তেজনার গুণে তাহার বিপরীত ফল হয়। তাঁহারা বুঝেন না যে সমাজের উপর কাহারও কোন হাত নাই, ক্ষমতা পরিচালন কেহই করিতে পারেন না। সামাজিক যে সকল পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা আপনা হইতে হয়। সমাজ তাহা আপনিই করিয়া লন। সময় ও অবস্থা বুঝিয়া সমাজ নিজ পরিবর্ত্তন নিজে করিয়া থাকেন। এই আমাদের চাতুর্ব্বর্ণ্য, এ কে করিল, ইহারও কর্ত্তা সমাজ নিজে; গুণ ও কর্ম্মানুসারে সামাজিক লোক আপনি চারিভাগে বিভক্ত হইয়া যায়, পরে আরও বিভাগ হইয়াছে, তাহাই বা কে করিল, তাহার কর্ত্তা সমাজ নিজে কোন ব্যক্তি বিশেষ, কোন সময়ে এই বিভাগ সম্পাদন করেন নাই। সমাজের উপর এমন কাহারও কর্ত্তৃত্ব নাই। মনে

কর ইংরাজ জাতি, যাঁহারা জাতিভেদ মানেন না, একটু ভাল করিয়া তাঁহাদের সামাজিক অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখিতে পাইবে, তাঁহাদের ভিতর গুণ-কর্ম্মানুসারে বিভিন্ন জাতির বা সম্প্রদায়ের ছাঁচ বাঁধিতেছে। আবার সম্প্রদায়ের ভিতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায় জন্মিতেছে। সেখানে বণিক (merchant) ও ব্যবসাদার (trader) বিভিন্ন সম্প্রদায়। তবে সামাজিক নিয়মানুসারে বিভিন্নতা রক্ষার ভিন্ন প্রথা মাত্র। যাহা হউক, পরের কথায় দরকার নাই। পূর্ব্বে যাহা বলিতেছিলাম, সমাজ এক্ষণে যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিয়া আপনার কার্য্য কর, যখনকার যে কার্য্য তখন সেই কার্য্য সুচারুরূপে সমাধা কর. তোমার কর্ত্তব্য সাধনে তোমার উপকার হইবে, তুমি যে পরিবারের অন্তর্গত তাহার উপকার হইবে, তোমার দেশের উপকার হইবে। সকল কার্য্যই স্থান ও কাল সাপেক্ষ এক স্থানে বা এক সময়ে এক কথায় যে কার্য্য সিদ্ধি হইবে, অকালে বা স্থান বিচার না করিলে সহস্র কথায় তাহা হইবে না, সুতরাং এক্ষণে অনর্থক সামাজিক কথার আন্দোলনে যোগ দিয়া তোমার কর্ত্তব্য হানি করিবে না।

ধর্ম্মনীতি—রাজনীতি সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, সামাজিক বিষয়ে যাহা বলিলাম, ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে ও ঠিক তাহাই বক্তব্য। পূর্ব্বে বলিয়াছি, তোমার জীবনের তিনটী লক্ষ্য স্থির করিয়া প্রথম হইতে তাহারই জন্য তোমাদের সকলের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য বিদ্যা, ধর্ম্ম, ও জ্ঞান। তুমি এক্ষণে কর্ত্তব্য সাধনের প্রথম স্তরে

আছ। অগ্রে এই স্তরের কার্য্য শেষ কর, পরে যখন ধর্ম্মস্তরে উঠিবে, তখন ধর্ম্ম সম্বন্ধে চিন্তা করিবে, কার্য্য করিবে। এক্ষণে বংশগত, জাতিগত নিয়ম রক্ষা করিয়া, তাহাকে ধর্ম্ম বলিতে হয় বল, ততটুকু ধর্ম্ম কর্ম্ম করিয়া, বিদ্যোপার্জ্জনের জন্য একাগ্রভাবে চেষ্টা করিবে।

উপরে বলিয়াছি বিদ্যা দুই প্রকার, এক বিদ্যা যাহা তুমি এক্ষণে অভ্যাস করিতেছ, সাহিত্য, নীতি, বস্তুতত্ত্বাদি বিষয় পার্থিব বিদ্যা, অপর বিদ্যা আধ্যাত্মিক বিদ্যা, যাহা দ্বারা অপার্থিব বিষয়ের জ্ঞান জন্মে অর্থাৎ ভগবানের তত্ত্ব নিরূপণ করা যায়। এতদুভয় বিদ্যা শিক্ষার পারম্পর্য্য আছে। প্রথমে তোমরা এক্ষণে যে বিদ্যাভ্যাস করিতেছ এই পার্থিব অপরা বিদ্যা অর্জ্জন কর। তাহাতে কৃতবিদ্য হইলে অপার্থিব অর্থাৎ পরা বিদ্যাভ্যাস কবিবে এবং তখন দেখিতে পাইবে কেমন করিয়া বিদ্যাস্তর হইতে অতর্কিত ভাবে মানুষ ধর্ম্মস্তরে উঠে। এখন হইতে ধর্ম্মের জন্য উৎকণ্ঠিত হইবে না। নিজের কর্ত্তব্য সাধনই ধর্ম্ম। এক্ষণে তুমি যে বিদ্যা শিক্ষা করিতেছ অনন্যমনা হইয়া অভ্যাস করাই তোমার কর্ত্তব্য, এবং ইহাই এক্ষণে তোমার সাধনা, তপস্যা। পূর্ব্বে তোমাকে সেই কাশীতে আমাদের যে "ব্রহ্মানন্দ" নামক ব্রহ্মচারীর সহিত আলাপ হয়, তাঁহার বিষয় কিছু বলিয়াছি তিনি যে সময়ে ঐ সকল কথা বলেন, সে সময় তুমি তথায় উপস্থিত ছিলে, কিন্তু তখন তুমি অত্যন্ত শিশু তাঁহার বাক্যের অর্থাবগত হইতে

পার নাই। তাঁহার কথার তাৎপর্য্য যে বিনা বিদ্যায় ধর্ম্ম লাভ হয় না। তাঁহার বিদ্যা ছিল না, তিনি ধর্ম্ম সাধনার জন্য কত দেশ ভ্রমণ করিলেন, কত সাধু সন্ন্যাসীর সেবা করিলেন, কত প্রাণপণে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। অবশেষে তিনি ৺কাশীধামে আসিয়া বিদ্যাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এতদিনে বোধ হয় তাঁহার পাঠ সমাপ্তি হইয়াছে, ধর্ম্মচর্চ্চায় রত হইয়াছেন। আর একদিনের কথা তোমার বোধ হয় মনে থাকিতে পারে, আমরা যেবার পূজায় অবকাশে ৺পুরীধামে সপরিবারে বাস করিতেছিলাম, পরম পবিত্র গোবর্দ্ধন মঠের কর্ত্তা পরম শ্রদ্ধাস্পদ পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎ মধুসূদন তীর্থ স্বামী, যিনি ৺শঙ্করাচার্য্যের স্থলাভিষিক্ত, তাঁহার কৃপায় আমরা সর্ব্বদা তাঁহার নিকট থাকিতাম। একদিন অপরাহ্নে আমরা অনেকে বসিয়াছিলাম, এমন সময়ে ডাকযোগে তাঁহার একজন ব্রহ্মচারী শিষ্যের নামে একখানি সংবাদপত্র আসিল, স্বামীজী উহা উন্মোচন করিবামাত্র তদভ্যন্তর হইতে একটী ক্ষুদ্র অস্ত্র বাহির হইল। অস্ত্রখানি দেখিয়াই স্বামীজী ঈষৎ হাস্য করিয়া শিষ্যকে আহ্বান করিলেন। ইত্যবসরে আমাদের বুঝাইয়াদিলেন যে হঠযোগীরা উক্ত যন্ত্র সাহায্যে জিহ্বার নিম্নের শিরা ছেদন করিয়া থাকে তাহাতে জিহ্বা উল্টাইয়া গলদেশে দিলে যোগ অভ্যাস সহজে হয়। শিষ্য আসিবামাত্র বলিলেন তোমার এই

যন্ত্র এই পত্রের মধ্যে আসিয়াছে গ্রহণ কর, কিন্তু আমার নিকট প্রতিজ্ঞা কর ইহা কখন ব্যবহার করিবে না। প্রথমে বিদ্যাভ্যাস কর (যোগ শাস্ত্র অধ্যয়ন কর) পরে ধীরে ধীরে যোগাভ্যাস করিবে। আমি তোমার গুরু, আমার আদেশ যে তুমি এ প্রকার প্রক্রিয়া করিবে না, ইহাতে ধর্ম্ম না হইয়া অধর্ম্ম হয়, যোগাভ্যাস এত তাড়াতাড়ির জিনিস নয়, ধৈর্য্যাবলম্বন কর, কালে প্রকৃত সময়ে অবশ্যই অভ্যাস হইবে। ইত্যাদি অনেক উপদেশ দিলেন। তাহা হইতে বুঝা গেল পরম পণ্ডিত ও পরম যোগশীল স্বামীজীর মতে বিদ্যাভ্যাস অগ্রে প্রয়োজন, পরে যোগাভ্যাস করিতে হয়; ইহাকেই আমি বলিতেছিলাম স্তরে স্তরে উঠা। লম্ফ দিয়া উঠিতে গেলে পদস্খলন হইবার খুব সম্ভাবনা এবং পদস্খলন হইলে হস্ত পদাদি ভগ্ন হইবার ও খুব সম্ভাবনা। অতএব আস্তে আস্তে যেমন কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া যাইতেছ তাহাই কর, ধর্ম্মের জন্য উৎকণ্ঠিত হইবে না, তাড়াতাড়ি করিবে না; ধর্ম্ম জিনিসটা ভাল, কিন্তু সকল ভাল জিনিস সকল সময়ে এবং সকল অবস্থায় ভাল হয় না। সময় ও অবস্থা ক্রমে ভাল জিনিস ও মন্দ হইয়া দাঁড়ায়। আমাদের এদেশে আমাদের পরম পবিত্র ঋষিগণ প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের ও আচার ব্যবহারের এত খারাপ অবস্থা হইয়াছে কেন? প্রকৃত ধর্ম্ম হইতে আমরা এত দূরে পড়িয়াছি কেন? যথার্থ ধর্ম্ম তত্ত্ব ছাড়িয়া, ভগবৎতত্ত্ব ত্যাগ করিয়া আমরা বৃথা

বাজে জিনিস লইয়া এত ব্যস্ত রহিয়াছি কেন? ইহার একমাত্র উত্তর আমাদের হস্তে ধর্ম্মকর্ম্মের ভার ন্যস্ত হওয়ায় এরূপ ঘটিয়াছে। ব্রাহ্মণের প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য ছিল অধ্যয়ন পরে অধ্যাপনা এবং তৎপরে যজন ও যাজন। ব্রাহ্মণ যে দিন তাহার ব্যতিক্রম করিলেন, অধ্যয়ন অধ্যাপনা ত্যাগ করিয়া যজন ও যাজনে মন দিলেন, সেই দিন হইতেই আমাদের অধঃপতন। যাজন ত পরের কথা, যজন করিবে কে? তাঁহার তত্ত্বস্থির, বিনা-অধ্যয়নে কিরূপে হইবে? গোটাকতক মোটামুটি কথা শিখিয়া লইয়া যজন যজনা চলে না, চলিলে তাহার যে ফল হইবার তাহাই হইয়াছে। শাস্ত্র ভাল করিয়া পাঠ করা চাই। দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করা চাই, তাহার পর ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিয়া অবশেষে যজন ও যাজন। তাহা না করিয়া "সহর্ণের্ঘঃ" পাঠ করিয়া ভট্টির কয়েকটি শ্লোক, একটু অভিধান, বড়জোর অষ্টাবিংশতি তত্ত্বের একাংশ পড়িয়া তিনি যাজন ক্রিয়ার জন্য প্রস্তুত হইলেন। ফলে তাঁহার নিজের কিছু জ্ঞান জন্মিল না, পরকে কি জ্ঞান দিবেন। নিজেই যজন কাহাকে করিতে হয়, কিরূপে করিতে হয়, তাহা শিখিলেন না, যাজন করিবেন কি করিয়া? সেইজন্যই এখন কার দিনে অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদের সংঘর্ষে আসিয়া ব্রাহ্মণেতর জাতিরা ব্রাহ্মণদিগকে আর মানিতে চাহেন না। সম্মান পাই-বার বস্তু না থাকিলে, কেবল অভিজাত্যাভিমানে কয় দিন আর মান পাইতে পারা যায়? ব্রাহ্মণ যে জন্য ভারতে এত

মান্য, সকলের পূজ্য ছিলেন, ব্রাহ্মণের সে জ্ঞান এখন কোথায়? ব্রহ্মজ্ঞান না হইলে কি ব্রাহ্মণ হয়। ব্রাহ্মণ বংশে জন্মিলেই ত ব্রাহ্মণ হয় না। উপনয়ন হইলেও ব্রাহ্মণ হয় না। তিলক যজ্ঞসূত্রাদি ব্রাহ্মণের বাহ্যিক লক্ষণ মাত্র কিন্তু অন্তরের সে সার বস্তুটুকু সে ব্রহ্মজ্ঞানটুকু এখন কোথায়? প্রকৃত ব্রাহ্মণ পদ বাচ্য হইতে হইলে, ব্রহ্মজ্ঞান থাকা আবশ্যক। ব্রহ্মজ্ঞান আপনা হইতে হয় না। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে বিদ্যা-শিক্ষা করিতে হয়, ব্রহ্মবিদ্যা দর্শন-শাস্ত্র সম্যক পর্য্যালোচনা না করিলে হয় না। আবার দর্শন-শাস্ত্র সম্যক উপলব্ধি করিতে হইলে তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী সাধারণ জ্ঞানজনক বস্তুতত্ত্ব ভাষা তত্ত্বাদি শিক্ষা করা চাই। সুতরাং এক্ষণে যে বিদ্যা শিক্ষা করিতেছ ইহা ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষার প্রথম সোপান, ইহা উপেক্ষা করিয়া একেবারে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের চেষ্টা করা বৃথা। একদিন ৺বারানসী ধামে মহাত্মা ভাস্করানন্দ স্বামীজীর মুখে একটা বড় পরিহাসের কথা শুনিয়াছিলাম, একদিন তিনি আমাকে বলিলেন, "দেখ তোমাদের কলিকাতার অনেক বাবু এখানে আসিয়াই আমার নিকট হইতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া পরের গাড়ীতে কলিকাতায় ফেরৎ যাইতে চাহেন।" কথাটা এত ব্যঞ্জক ভাবে বলিলেন, যে তাহাতে আমার একটু লজ্জা হইল। কথাটা ঠিক, ব্রহ্মজ্ঞান এত সহজ প্রাপ্য জিনিস নয়, ইহার জন্য অনেক চেষ্টা করিতে হয়, অনেক শিক্ষা করিতে হয়, আবার এই দর্শন

শাস্ত্র অধ্যয়ন সম্বন্ধে একদিন পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ যোগীবিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী স্বামীজী বলিয়াছিলেন, যে আজকাল সকলেই বেদান্ত অধ্যয়ন করেন এবং অনেকেই বেদান্ত অধ্যাপনা করেন। দর্শন শাস্ত্র পাঠ করিয়া তাহা আয়ত্ত করিবার জন্য জমী তৈয়ার করিতে হয়, মস্তিষ্ক সে সকল দুরূহ ভাব গ্রহণোপযুক্ত করিবার জন্য প্রস্তুত করিতে হয়। পড়িলেই হয় না, বং পড়ানও বড় সহজ নহে। এই সকল মহাজন বাক্য স্মরণ করিয়াই আমার ধারণা, সহসা এই কঠিন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। তাহাতে সে সকল কঠিন বিষয় আয়ত্ত হয় না, বৃথা শ্রম ও সময় ক্ষেপ মাত্র। তাহা অপেক্ষা পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি যদি স্তরে স্তরে উঠিবার চেষ্টা কর সে সকল কঠিন বিষয় সহজ বোধ্য হইবে, ঠিক ভাব গ্রহণ হইবে এবং পরিণামে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইতে পারিবে। পৌরাণিক ধ্রুব, প্রহ্লাদ, শুক, সনাতনাদি মহাত্মাগণের কথা পৃথক। যাঁহারা পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত বিশেষ সুকৃতি ফলে ভগবানের বিশেষ কৃপা লাভ করিয়াছিলেন, সে প্রকার মহাত্মাগণ আমাদের হিসাবের বাহিরে। তাঁহাদের সহিত সাধারণ মানবের তুলনা চলে না তাঁহাদের অদৃষ্ট লইয়া কয়জন জন্মিয়াছেন। ভগবান যাঁহাকে বিশেষ কৃপা কটাক্ষ করেন, তাঁহার কথা স্বতন্ত্র। আমরা সাধারণ মানবের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের কথা আলোচনা করিব মাত্র। ঐ সকল মহাত্মাদের কিসে কি হইল তাহা নির্ণয় করা আমার কর্ম্ম নহে তাহাতে আমার সামর্থ্যও নাই।

অনেক সময়ে দেখিয়াছি বিদ্যাভ্যাস কালে অনেক ছাত্র কোন একটা ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হইয়া সেই ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের আদরণীয় ধর্ম্মপালনে তৎপর হইয়া বিদ্যাশিক্ষায় জলাঞ্জলি দিয়াছেন। তাহাতে তাঁহাদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে কি লাভ হইয়াছে জানিনা। সাক্ষাৎ পক্ষে লেখাপড়ার পথে কণ্টক হইয়াছে, তাঁহাদের নিজের সাংসারিক উন্নতির অবরোধ হইয়াছে ; সঙ্গে সঙ্গে পিতামাতা, আত্মীয় স্বজনের আশা ভরসা সমূলে নির্ম্মূল করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহারা না নিজের উপকার করিয়াছেন, না তাঁহাদের হইতে সমাজের বা দেশের উপকার সাধিত হইয়াছে। অনেকে চৈতন্যাদি মহাত্মাগণের উদাহরণ দিয়া থাকেন। তাঁহারা জানেন না যে চৈতন্য মহাপ্রভু কিরূপ বিদ্যা-শিক্ষার পর সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছিলেন। আমি যে পথে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের কথা বলিতেছিলাম চৈতন্যদেবের ঠিক সেই পথে স্তরে স্তরে শিক্ষালাভ হইয়াছিল। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যেরও তাহাই, তবে এই সকল মহানুভবগণের সাধারণ জনগণ অপেক্ষা অল্পদিনে বিদ্যালাভ হইয়াছিল। সেটা তাঁহাদের অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় মাত্র, সকলেই কি সেইরূপ অসাধারণ মেধাবী। একের উদাহরণ অপরে প্রয়োগ করিতে হইলে সব উপকরণ গুলি ঠিক থাকা চাই। তাহা না বুঝিয়া হঠাৎ কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ে ঢুকিয়া ধর্ম্মোন্নতির চেষ্টা দ্বারা, না ধর্ম্মের উন্নতি হয়, না সমাজের উপকার হয়। হইবার মধ্যে যাহা প্রতিনিয়ত দেখিতেছি—সংসারে অনন্ত কষ্ট ও অপরিসীম লাঞ্ছনা।

এইরূপে কেহ বা বৈষ্ণব দলে কেহ বা থিওসফিষ্ট দলে কেহ বা ব্রাহ্ম সমাজে, কেহ বা রামকৃষ্ণ সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইয়া ইতঃভ্রষ্ট স্ততোনষ্ট হইয়াছেন। আমি কোন সম্প্রদায় বিশেষ ভাল কি মন্দ তাহা বলিতেছিনা। ধর্ম্মসম্প্রদায় কোনটিই মন্দ নহে। সকল সম্প্রদায়ই ভাল। তবে ভাল মন্দ বিচার করিবার তোমার এখন সময় কোথায়? তুমি যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তাহার যে ধর্ম্ম, তাহারই তত্ত্ব কতটুকু জান, কেবল ভাসা ভাসা গোটাকত মোটামুটী কথা দেখিয়া শুনিয়া জানিয়াছ মাত্র। যখন তুমি তাহার ভিতর প্রবেশ কর নাই, তাহার ভাল মন্দ জানিতে পার নাই তখন তাহার সহিত অন্য ধর্ম্মের তারতম্য বিচার কেমন করিয়া করিতে পার? এ সকল বিচার করিতে অনেক পড়িতে হয়, অনেক জানিতে হয়। তাহা তুমি এখন পারিয়া উঠিবে না, কাজে কাজেই তাহা হইতে তোমার এক্ষণে নিরস্ত থাকাই ভাল। যুবক লেখাপড়ার সময় ধর্ম্ম সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া পড়াশুনা ত্যাগ করার জন্য অনেক পিতামাতাকে আক্ষেপ করিতে দেখিয়াছি। সাক্ষাৎ দেবতা পিতামাতা, তাঁহাদের মতের বিরুদ্ধে, তাঁহাদের দুঃখের কারণস্বরূপ পুত্রের ধর্ম্ম চেষ্টায় যে কি ফল হয় তাহা আমি বুঝিতে পারি না। ইহাতে ধর্ম্ম হয় কি অধর্ম্ম হয় জানি না। ইহা উপরে যাহা বলিয়াছি তাহাই, ধর্ম্মের ন্যায় ভাল জিনিসের অপব্যবহার।

স্বল্প বিদ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মমত স্থায়ী হয় না। কয়েক দিন বা কয়েক বৎসর পরে আবার মত

পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। একবার যে ধর্ম্মে একজন বিশেষ আস্থা দেখাইলেন, কিছুদিন পরে জ্ঞানবৃদ্ধি ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে তাহাতে বীতরাগ হইয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ বা প্রথমে বংশ পরম্পরা ক্রমে যে ধর্ম্ম সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন তাহাতেই প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। আমাদের বন্ধুবর্গের ভিতর এমত লোক আছেন, তবে সুখের বিষয় ও সৌভাগ্যের কথা যে তাঁহাদের সংখ্যা বড় অধিক নহে। এটা কেবল অল্প শিক্ষার ফল, তারপর যাঁহারা অধিক শিক্ষা লাভ করেন, নিজের ভুল হয়ত নিজেই বুঝিতে পারেন, আর যাঁহারা তাহার পর আর শিক্ষা লাভ করিতে না পারেন, তাঁহারা কি ধর্ম্ম সম্বন্ধে, কি কর্ম্ম সম্বন্ধে চিরদিনই সকল সমাজের অধোদেশে পড়িয়া থাকেন, তাঁহাদের কষ্ট দেখিয়া, সহানুভূতি হয় বটে, শিক্ষালাভ করাও চাই।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলাম, বোধ হয় আর কিছু বলা আবশ্যক নাই। মোট কথা এখন যাহাতে পাঠে মনের একাগ্রতা নষ্ট হয়, যাহাতে চিত্তের চাঞ্চল্য উৎপাদন করে, যাহাতে তোমাকে নিজের বিচার বিবেচনা করিতে হইবে, এমন কোনও বিষয়ে মনোনিবেশ করিবে না। সংসার, পরিবার, সমাজ, দেশ সমস্তই যেমন চলিতেছে যতদিন শিক্ষা শেষ না হয়, ততদিন তেমনই চলিতে থাকুক, তুমি যে একজন সংসার মধ্যে, পরিবার মধ্যে বা দেশ মধ্যে আছ ইহা কেহ জানিতে না পারে এমন ভাবে সমাজ চক্ষুর অন্তরালে, নিজ

সময়োচিত কার্য্য অর্থাৎ বিদ্যাভ্যাস লইয়া সর্ব্বদা ব্যস্ত থাক, তাহাতে তোমাকে কেহ নির্ব্বোধ বলে, অসামাজিক বলে, এমন, কি অধার্ম্মিক বলে তাহাতে দুঃখিত হইবে না। শাস্ত্রগতপ্রাণ মনিষীগণ চিরদিনই এই ভাবে দিন যাপন করিয়াছেন। অনেক বিখ্যাত পণ্ডিতের সম্বন্ধে কত কি নির্ব্বুদ্ধিতার গল্প শুনিবে, সেটা তাঁহাদের নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় নহে, তাঁহাদের শাস্ত্রে একান্ত নিবিষ্টচিত্ততারই চিহ্ন, ইহা লজ্জার কথা নহে, শ্লাঘার কথা। কেবল এ দেশে কেন, সকল দেশেই এমন অনেক মনিষীর কথা শুনা যায়। কিছু দিন হইল সংবাদ পত্রে একজন জার্ম্মাণ পণ্ডিতের একটি গল্প প্রকাশিত হইয়াছিল। ইনি জার্ম্মাণির কোনও বিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক। তাঁহার এক ভগ্নী ভিন্ন আর সংসারে কেহ ছিল না। ভাই ভগ্নী একত্র বাস করিতেন। বহুকাল একটি বাটীতে বাস করিতেন, কিন্তু সে বাটীর সংখ্যা জানিতেন না। একদিন অধ্যাপনার পর বিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়াছেন এমন সময়ে অত্যন্ত বৃষ্টি আসিল, সম্মুখে একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ী যাইতেছিল তাহার চালক আগ্রহ সহকারে তাঁহাকে বাড়ীতে লইয়া কোন্ রাস্তায়, কত সংখ্যক ভবনে লইয়া যাইতে হইবে জিজ্ঞাসা করায় তিনি তাহা বলিতে পারিলেন না। তাহাতে গাড়োয়ান মহাগোলে পড়িল, কোথায় লইয়া যায়, কিছুতেই যখন তিনি নিজ বাটীর ঠিকানা বলিতে পারিলেন না, তখন শকট চালক তাঁহাকে পাগল স্থির করিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া যাইতে অনুরোধ করিল।

তিনি গাড়ী হইতে অবতরণ করিতেছেন এমন সময় হঠাৎ সেখানে তাঁহার একজন পল্লীবাসী ছাত্র তাঁহাকে তদবস্থায় দেখিয়া সমস্ত বিবরণ জ্ঞাত হইয়া শকট চালককে ঠিকানা বলিয়া দিলেন এবং পাছে পথে আরও কোন গোলযোগ হয় তাই সঙ্গে সঙ্গে গিয়া বাটীতে পৌঁছিয়া দিলেন। উক্ত অধ্যাপক মহাশয়ের সম্বন্ধে আরও একটা গল্প প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার ভগ্নী তাঁহার বেশি পথ চলিতে হয়, তাহা নিবারণ করিবার জন্য যে স্থানে তিনি অধ্যাপনা করিতেন, তাহার নিকটে আবাস গ্রহণ করিলেন। কিন্তু অধ্যাপক মহাশয় এমনি অন্যমনস্ক যে প্রতি দিন তিনি সেই দূরস্থ পুরাতন বাটীতে গিয়া তথা হইতে ফিরিয়া আবার নূতন আবাসে আসিতেন। যখন তাঁহার ভগ্নী একদিন নয়, তুইদিন নয়, এরূপ প্রত্যহই হইতেছে দেখিলেন, তখন তাঁহার ভ্রাতার সাহায্যার্থে সেই দূরস্থ পুরাতন বাটীতে আবার প্রত্যাগমন করিলেন। সেই জার্ম্মাণ অধ্যাপকই বল, আর আমাদের দেশের চলিত গল্পের নৈয়ায়িকদের কথাই বল, একই কথা, যিনি দিবানিশি শাস্ত্রগতপ্রাণ তিনি এ সকল সামান্য কথা কখনও মনে করিতে পারেন না। একটা মন নানা দিকে যায় না। মন এক জিনিসের উপর স্থাপন করিতে না পারিলে তাহাতে কখনও সিদ্ধি লাভ হইবার নহে। এ সম্বন্ধে মহাভারতের কৌরব-পাণ্ডবদের অস্ত্রবিদ্যা পরীক্ষার গল্পটি বড় শিক্ষাপ্রদ। দ্রোণাচার্য্য কৌরব ও পাণ্ডবদের সকলকেই অস্ত্র শিক্ষা দিয়াছিলেন। মহাত্মা ভীষ্ম শিক্ষক নির্ব্বাচন করিয়া-

ছিলেন, পরে কিছুকাল শিক্ষার পর ভীষ্ম মনে করিলেন ইহাদের কাহার কিরূপ শিক্ষা হইয়াছে একবার দেখা যাউক। সভা হইল পরীক্ষার্থী যুধিষ্ঠারাদি পঞ্চ ভ্রাতা এবং দুর্য্যোধনাদি শত ভ্রাতা একত্র হইলেন, মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য্য। পরীক্ষার জন্য দূরস্থ একটি বৃক্ষে একটি কৃত্রিম পক্ষী স্থাপিত হইল। উহার কণ্ঠচ্ছেদ করাই পরীক্ষা। প্রথম যুধিষ্ঠির আহূত হইলেন। যুধিষ্ঠির ধনুকে বাণ যোজনা করিয়া পক্ষীকে মারিতে উদ্যত হইতেছেন এমন সময় দ্রোণাচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি দেখিতেছ? যুধিষ্ঠির বলিলেন আমি সকলই দেখিতেছি, আমি সভাস্থ পার্শ্বস্থ সকলকে, বৃক্ষ ও বৃক্ষস্থ পক্ষীকে ও আপনাকে ও ধনুর্ব্বান সকলই দেখিতেছি। ইহা শুনিয়া দ্রোণাচার্য্য বলিলেন, তোমার কিছুই শিক্ষা হয় নাই। এইরূপ কেহ বলিলেন, কেবল বৃক্ষই দেখিতেছেন, কেহ বলিলেন, কেবল পক্ষী দেখিতেছেন, তাহাদিগকে ঐরূপ তিরস্কার করার পর অর্জ্জুনকে আহ্বান করিলেন এবং ঐরূপ জিজ্ঞাসা করায় অর্জ্জুন বলিলেন আমি ছেদ্য পক্ষী-কণ্ঠ ছাড়া আর কিছুই দেখিতেছি না। তখন দ্রোণাচার্য্য পরম সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, তোমারই শিক্ষা ঠিক হইয়াছে। যে ব্যক্তি লক্ষ্য ছাড়া আর কিছু দেখে তাহার শিক্ষা হইল কৈ? সুতরাং শিক্ষার একমাত্র উপায় একাগ্রতা। অন্য কোন দিকে মন দিলে বিদ্যাভ্যাসের বিষম ত্রুটী হয়। আজ কাল কিন্তু শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ

ও আমাদের মধ্যে অনেক গণ্য মান্য শিক্ষিত বিজ্ঞ মহোদয়গণ ছাত্রদিগের মন তাহাদের শিক্ষণীয় বিষয় ব্যতীত অপর অনেক দিকে আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই ভাল। ক্রমাগত পাঠ দ্বারা ছাত্রগণের শরীর দুর্ব্বল ও মন নিস্তেজ হইয়া পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে অন্য প্রকার নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদে তাহাদিগকে নিয়োজিত করিতে পারিলে তাহাদের শরীর ও মন ভাল থাকিবে, লেখা পড়া ও ভাল হইবে। সুতরাং তাঁহাদের উদ্দেশ্য খুব সাধু সন্দেহ নাই। কিন্তু এ প্রকার ছাত্রদিগের মন অন্যদিকে আকৃষ্ট করায় তাহাদের পড়াশুনার ক্ষতি হয় কি না, ইহা ভাল করিয়া বিবেচনা করা আবশ্যক। যুবক-দিগকে উচ্চ শিক্ষার সহায়তা জন্য কয়েকজন বিশিষ্ট শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত মহোদয় ইউনিভারসিটি ইন্‌স্‌টিউট্ নামক এক সমিতি করিয়াছেন, তাহাতে সুশিক্ষিত বয়োধিক প্রবীণ লোকের সহিত যুবক ছাত্রবৃন্দ একত্র আসীন হইয়া তাঁহাদের উপদেশ শুনিয়া, তাঁহাদের শিক্ষা গ্রহণ করিয়া কতরূপে উপকৃত হইতেছেন। যুবকগণের আনন্দ-বর্দ্ধন জন্য সেখানে নানাবিধ আয়োজন নানা সময়ে হইয়া থাকে। আবৃত্তিকে সেকালের টোলের অধ্যাপকগণ বড় আদর করিতেন। তাঁহারা এমন কি আবৃত্তি, বোধ অপেক্ষা গরিয়সী বলিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। ততদূর ঠিক না হউক আবৃত্তি যে বিদ্যাভ্যাসের পক্ষে সহায়তা করে তাহাতে সন্দেহ

মাত্র নাই। তাহার উপর উচ্চারণ শিক্ষা। ইহাও বড় উপকারী। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা সমস্তই লিখিয়া হইয়া থাকে। উচ্চারণ পরীক্ষার কোন উপায় নাই। শিক্ষকগণের উচ্চারণাদি পরীক্ষা হইবার নিয়ম হইয়াছে কিন্তু বিদ্যার্থীদের উচ্চারণ শিক্ষা বা পরীক্ষার কোন ব্যবস্থাই নাই। ফলে বড় বিষম হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এমন অনেক কৃতবিদ্য যুবক প্রতিষ্ঠাপত্র গ্রহণ করিয়া সংসারে প্রবিষ্ট হন যাঁহাদের উচ্চারণ বড় কদর্য্য। অনেক সময়ে ইংরাজেরা তাঁহাদের ইংরাজী উচ্চারণ বুঝিতে পারেন না। অপর প্রদেশের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা তাঁহাদের সংস্কৃত উচ্চারণ বুঝিতে পারেন না। উচ্চারণ যে শিক্ষার একটা অঙ্গ ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে, বিশেষ আমাদের দেশে যেখানে মন্ত্র শক্তির প্রভাব সর্ব্বত্র সুপরিজ্ঞাত, এখানে উচ্চারণ বিকার জন্য যে আমাদের কি ক্ষতি হয় তাহা আর বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। সেই জন্য আমি চিরদিনই আমাদের প্রদেশে প্রচলিত সংস্কৃত উচ্চারণের বিরোধী। কাশী অঞ্চলে, মহারাষ্ট্র প্রদেশে ও দ্রাবিড়ে সংস্কৃত যে ভাবে উচ্চারিত হইয়া থাকে, তাহাতে স্থানে স্থানে একটু একটু বিকৃত হইলেও আমাদের বঙ্গদেশের সংস্কৃত উচ্চারণ যে প্রকার বিকৃত ও দুষ্ট হইয়াছে, এমন আর কোথাও হয় নাই। ইহা বাঙ্গালা-দেশের একটা বড় অখ্যাতির কথা। এখানে হ্রস্ব দীর্ঘ

তেমন স্পষ্ট উচ্চারিত হয় না, "ন" ও "ণ" দুইটীর উচ্চারণস্থান বিভিন্ন হইলেও এবং তাহা জানা সত্ত্বেও একরূপই উচ্চারিত হইয়া থাকে। তবে ভারতের অনেক স্থানে "ণ" যে "ড়" রূপে উচ্চারিত হইয়া থাকে তাহাও ঠিক নহে। আমাদের কাছে "য" ও "জ" বিভিন্ন হইলেও একরূপে উচ্চারিত হয়। "শ", "ষ" "স" তিনটির পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার করি বটে, কিন্তু কার্য্য কালে আমরা তিনটির একরূপই উচ্চারণ করিয়া থাকি। বাঙ্গালার বাহিরে আবার অনেক স্থলে "য" কোথাও "খ" কোথাও "ছ" রূপে উচ্চারিত হয়, তাহার ও আমি পক্ষপাতী নহি। এইরূপ সংস্কৃতের উচ্চারণ বিভ্রাট যে কত ঘটিয়াছে তাহা বর্ণণাতীত। আক্ষেপের বিষয় এই অশুদ্ধ উচ্চারণ ত্যাগ করিতে অসমর্থ বলিয়া অনেকে আবার উহার পক্ষপাতী। আমাদের একজন শ্রদ্ধেয় বন্ধু মধ্যে মধ্যে উক্তরূপ অসংস্কৃত উচ্চারণ জন্য পারিতোষিক দিয়া থাকেন। এরূপ উচ্চারণ দোষ যাহাতে শীঘ্র বিলয় প্রাপ্ত হয় তজ্জন্য খুব চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। পণ্ডিত মণ্ডলীর এ বিষয়ে একটু উদ্যোগী হওয়া আবশ্যক, এবং তোমরা যাহারা সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতেছ তোমাদের তৎপ্রতি দৃষ্টি থাকা কর্ত্তব্য। ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউট এ বিষয়ে উৎসাহ দান করিয়া আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। সদুচ্চারণ শিক্ষা সম্বন্ধে ইহা দ্বারা অনেক সাহায্য হইতেছে।

বিদ্যার্থীর সঙ্গীত শিক্ষা সম্বন্ধে আমার মত বড় বিরুদ্ধ। সঙ্গীত ও একটী বিদ্যা। সাহিত্য বিজ্ঞান নীতি শাস্ত্র প্রভৃতি অপেক্ষা সঙ্গীত কিছুতেই কম মূল্যবান বা আদরণীয় বিদ্যা নহে, ইহাতে ব্যক্তিগত ও সমাজগত যে উপকার হয় বা হইতে পারে তাহা অপর কোন বিদ্যা দ্বারা তত সহজরূপে হইতে পারে কিনা সন্দেহ। এত বড় সঙ্গীত বিদ্যাকে একটা অপর বিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে, ক্রীড়ার জিনিসরূপে ব্যবহার করা সঙ্গীতবিদ্যার অবমাননা। ইহাতে যে বিদ্যা শিক্ষার জন্য তোমরা চেষ্টা করিতেছ তাহাতে বিঘ্ন হয় এবং সঙ্গীত ও শিক্ষা হয় না। এক ত বাঙ্গলা দেশে আসিয়া সঙ্গীতটা প্রায়ই আমোদের উপকরণরূপে ব্যবহৃত হইয়া, এখানে সঙ্গীতের অধঃপতন হইয়াছে, তাহাতে আবার তাহাকে ছাত্রদের ক্রীড়ার পদার্থ করিয়া দিয়া হেয় করা কেন? যদি কোনও ছাত্রের সঙ্গীতের জন্য আগ্রহ থাকে, তিনি উপস্থিত যে বিদ্যাশিক্ষার চেষ্টা করিতেছেন তাহার সমাপ্তি করিয়া সঙ্গীত শিক্ষায় মনোনিবেশ করিতে পারেন। ইহাতে মন পবিত্র হয়, চিত্ত শুদ্ধ হয়। সাধনার ও ইহা অন্যতম উপায়। সেই জন্যই পশ্চিমাঞ্চলে ইহার এত আদর। আমাদের এখানেও স্বর্গীয় রামপ্রসাদ সেন, কমলাকান্ত, দাওয়ানজী মহাশয় প্রভৃতি সাধক মণ্ডলী সঙ্গীত বিদ্যার যথেষ্ট সম্মান রক্ষা করিয়াছেন। আর সাধারণতঃ আমরা যে সঙ্গীত শুনিয়া আনন্দানুভব করি

তাহা সঙ্গীতই নহে। তাহা একরূপ শব্দ বিদ্যামাত্র। এ কথা আমি নিজে কিছুই বুঝি না। একদিন ইউনিভার্সিটি ইনসটিটিউটে একজন মান্দ্রাজী সঙ্গীতাধ্যাপক ইহা আমাদের এখানকার সমবেত সঙ্গীতজ্ঞ মহোদয়ের সাক্ষাতে বিবৃত করেন। সঙ্গীতের ন্যায় গভীর পদার্থকে সামান্য আনন্দ উপভোগের উপকরণ করিয়া তুলিয়া বঙ্গদেশে সঙ্গীতের এই দুরবস্থা হইয়াছে। সেই জন্য আমার মত, যে ব্যক্তি সঙ্গীতে সম্যক্ মনোনিবেশ করিতে না পারিবেন তিনি ইহাকে এরূপ হেয় আনন্দকর পদার্থরূপে ব্যবহার না করেন। আরও একটু বিবেচ্য কথা যে যাহারা একটা বিদ্যাভ্যাস করিতেছে, তাহাদের এত আনন্দানুভবের চেষ্টা কেন? তাহাদের নিজের আরাধ্য বিদ্যাই তাহাদিগকে যথেষ্ট আনন্দ প্রদান করিবে। এই সঙ্গে অপর একটি কথা সংক্ষেপে বলিয়া রাখি। ইংরাজী বিদ্যালয়ের অনুকরণে আজ কাল অনেক সময় ছাত্রগণ আমোদ উপভোগ করিবার জন্য নাটকাভিনয় করিয়া আপনারা আনন্দিত হন অপরকেও আনন্দিত করেন। ইহারও আমি পক্ষপাতী নহি। ইহা চিত্ত সংযমের পক্ষে ঘোর অন্তরায়। আপনি আনন্দিত হইতে হইলে নাটক পাঠ করিয়া তাহার চমৎকারিত্ব সম্যক্ অনুধাবন করিয়াই যথেষ্ট আনন্দানুভব হয়। রঙ্গমঞ্চে দাঁড়াইয়া অভিনয় করাটা কেমন মানসিক দৌর্ব্বল্যের লক্ষণ বলিয়া মনে হয়। আমাদের একজন শিক্ষক ছিলেন তিনি একখানি যুদ্ধ সম্বন্ধে পুস্তক (Southey's

Life of Nelson) পড়াইতে ছিলেন। ভাষায় ঠিক অবস্থা ও ভাব প্রকাশ হইল কিনা সন্দেহ করিয়া তিনি প্রত্যেক যুদ্ধের একটি করিয়া মানচিত্র আঁকিয়া ছাত্রগণকে বুঝাইয়া দিতেন। ভাষায় যাহা চিত্রিত হইয়া সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়াছে তাহার আবার মানচিত্র কেন? ভাষাদ্বারাই যথেষ্ট ভাব গ্রহণ করিয়াই বুদ্ধিমান পাঠক আমোদ লাভ করেন। কবিরও তাহাতে বেশি কৃতিত্ব। অভিনয় করিয়া বা দেখিয়া আনন্দানুভব করা তাহা অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর আনন্দ, অপেক্ষাকৃত কম বুদ্ধিমান, অশিক্ষিত লোকের জন্য। তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া বিদ্যার্থীর কর্ত্তব্য নহে। ইহাতে চিত্তচাঞ্চল্য হয়, বিদ্যাভ্যাসে একাগ্রতা কমিয়া যায়। অন্ততঃ সাময়িক অনিষ্ট হয় তাহাতে সন্দেহ নাই।

ব্যায়াম সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। ব্যায়াম অভ্যাস করিতে এখন সকলেই উৎসাহ দিতেছেন। এ সময়ে তাহার প্রতিকূলে বলিতে সাহস হয় না। কেবল যে হাস্যাস্পদ হইব বলিয়া সাহস হয় না, তাহা নহে। পাঁচ জন শিক্ষিত লোকে যাহা ভাল বলেন, তাহা যে আমার মন্দ বোধ হয় সেটা সম্ভবতঃ আমার বুঝিবার ভুল। আমার নিজের মত যে অভ্রান্ত আর সকলে ভ্রান্ত এ কথা বলিলেই বড় নির্ব্বোধের ন্যায় বলা হইবে। তবে এ বিষয়ে আমার মত অপর পাঁচ জন হইতে কেন ভিন্ন তাহা প্রকাশ করিতেছি। ব্যায়ামের উপকারিতা কি? শরীরের পেশি

সকলের উন্নতি সাধন করা এবং বিবিধ প্রকারে দৈহিক বল সঞ্চয় করা। ইহা যে ভাল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কাহার পক্ষে ইহা দরকার? যাহারা দৈহিক বলের উপর নির্ভর করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিবে, তাহাদের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয়, কিন্তু তাহা সকলের পক্ষে নহে। সেকালের ক্ষত্রিয়গণ মল্লযুদ্ধাদিতে দক্ষ হইবার জন্য ব্যায়াম শিক্ষা করিতেন। এখনও সিপাহী ও পালোয়ানেরা রীতিমত ব্যায়াম শিক্ষা করেন। তাহা ছাড়া শ্রমজীবী লোকে নিজের জীবিকা অর্জ্জন জন্য বাল্যাবধি অঙ্গচালনা দ্বারা শরীর বলিষ্ঠ রাখে। না করিলে চলে না সেইজন্য তাহাদের উহা প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের তাহাতে প্রয়োজন কি? আমাদের যাহাতে দীর্ঘজীবন হয় ও শরীর নীরোগ থাকে তাহা করিলেই যথেষ্ট। শরীরে বল থাকা ও দীর্ঘজীবন বা নীরোগ থাকা একই কথা নহে। বলিষ্ঠ লোককেও স্বল্পায়ু হইতে দেখা যায়, আবার বলিষ্ঠ নয় অথচ সুস্থ শরীর লইয়া মানুষ দীর্ঘজীবী হয় তাহাও দেখিতে পাওয়া যায়। অশীতিপর বৃদ্ধ চৌধুরী মহাশয় এবং শতাধিক বৎসর বয়স্ক ঘোষাল মহাশয়কে তুমি স্বচক্ষে দেখিয়াছ। ইহাঁরা কেহই বলিষ্ঠ নন্, ইহাঁদের শরীর যে কখন বলবান্ ছিল তাহা বোধ হয় না, অথচ ইহাঁদের শরীরে কোনও রোগ নাই। ঈশ্বরেচ্ছায় ইহাঁরা এইভাবে আর ও দীর্ঘজীবী হউন, ইহাঁরা আজও নিজের জীবিকা উপার্জ্জন করিতেছেন।

ঘোষাল মহাশয় ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত স্থানে প্রতিনিয়ত বাস করেন অথচ তিনি বলেন তাঁহার কখন জ্বর হয় নাই। শরীর সুস্থ রাখিতে পারিলেই ভাল থাকে তাহাতে বড় বেশি কিছু করিতে হয় না। নিয়মিত ভাবে চলিলেই শরীর ভাল থাকে। এই প্রবন্ধে যে ভাবে চলিবার উপদেশ দিতেছি বোধ হয় এই ভাবে চলিলেই শরীর সুস্থ থাকিতে পারে। দীর্ঘ জীবন লাভ-করা ঈশ্বরের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে। তবে মানুষের চেষ্টায় এতটুকু হইতে পারে যে আকস্মিক বিপৎপাতে জীবন নষ্ট না হইলে সুস্থ শরীর থাকিলেই জীবন দীর্ঘ হইতে পারে। সেকালে ব্যায়াম বলিয়া ব্রাহ্মণেরা কিছু জানিতেন না, করিতেন না, অথচ শতায়ু লোকের সংখ্যারও কম ছিল না। এখন বিবেচ্য, শরীর বলবান্ করা দরকার, না কেবল সুস্থ থাকিলেই সন্তুষ্ট থাকা ভাল। যাহাদের বিদ্যা বুদ্ধি প্রয়োগ দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিতে হইবে, ধনী বা যশস্বী হইতে হইবে, যাহাদের ধন মান মস্তিষ্ক পরিচালনার দ্বারা উপার্জ্জন ও সংরক্ষণ করিতে হইবে, দৈহিক বলের দ্বারা নহে, তাহাদের কি কেবল সুস্থ শরীর থাকিলেই চলিবে না? তাঁহাদের দৈহিক যাহা পাশব বা আসুরিক বল বলিলে অন্যায় হয় না সে বলের প্রয়োজন কি?

কোন ব্যক্তি ব্যাঘ্রের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিয়াছেন, কেহ বা অশ্বদ্বয় যোজিত শকট টানিয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন, কেহ বা একাকী দশজন প্রতিদ্বন্দীর সহিত যুদ্ধ

করিয়া পদক্ষিপ্ত বর্ত্তুলক্রীড়া বা মল্লযুদ্ধে পরাজয় করিয়াছেন, ইত্যাদি কথা অনেক সময় শুনা যায় এবং শুনিয়া সকলে বড় আনন্দিত হইয়া থাকেন। সমাজে সে শ্রেণীর লোক থাকাও দরকার। কিন্তু তাহা বলিয়া কি সকলকেই সেই শ্রেণীভুক্ত হইতে হইবে? সকলকেই কি দৈহিক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। চিন্তাশীললোকের যাহাতে বিদ্যাবুদ্ধির উন্নতি হয়, মস্তিষ্ক পরিষ্কার থাকে, তাহার চেষ্টা করা প্রয়োজন। আমাদের সমাজের মধ্যে অধুনাতন কালে অনেক অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন মনীষী আছেন যাঁহারা বাল্যে বা যৌবনে ব্যায়াম করেন নাই। তাঁহাদের বাল্যকালে বা যৌবনে ব্যায়ামের উপকারিতা সম্বন্ধে কোন কথাই বোধ হয় উঠে নাই। অথচ তাঁহারা এখন বৃদ্ধ হইয়াছেন, স্বীকার করিতেই হইবে তাঁহারা চিন্তাশীলতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রতি-নিয়তই দিতেছেন তাহাই আমার পক্ষে উপস্থিত কথার যথেষ্ট প্রমাণ। এ সকল জীবন্ত দৃষ্টান্ত ছাড়িয়া আমি কোথায় বলবান্ চিন্তাশীল বৃদ্ধ খুঁজিয়া বেড়াইব। আমার স্বর্গীয় পিতামহাশয়ের কথা পূর্ব্বে একবার উল্লেখ করিয়াছি তিনি ৯৫ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। তিনি একজন স্মার্ত্ত ও পৌরাণিক ছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ব্বেও দেখিয়াছি তিনি কোন গ্রন্থ না দেখিয়া স্মৃতি শাস্ত্রের কোথায় কি আছে, নখদর্পণের ন্যায় বলিতে পারিতেন, কেবল তাহাই নহে কোন্ গ্রন্থের কোন্

টীকায় কে কি বলিয়াছেন তাহা পুস্তকাদির বিনা সাহায্যে বলিতে পারিতেন, আর তাঁহার পুরাণাবৃত্তির ক্ষমতা অপরিসীম ছিল। এ সকল লোক কখন ব্যায়াম অভ্যাস করিয়াছিলেন কি? আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি—না। শারীরিক বলবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি বৃত্তির হ্রাস হয় কি না? বুদ্ধি ও শারীরিক বলের ভিতর কেমন যেন একটা বিপরীত অনুপাত (inverse ratio) আছে বলিয়া মনে হয়। শারীরিক বল না থাকিলেও মানুষ বুদ্ধিমান হইতে পারে, কিন্তু ইহার বিপরীতটা সত্য নহে যে শারীরিক বল না থাকিলেই বুদ্ধিমান হইতে পারে অথবা বুদ্ধিমান হইলেই তাহাকে হীন বল হইতে হইবে। সুস্থ শরীরে যাহার যতটুক বল থাকা সম্ভব ততটুকু বল থাকা চাই, তাহার কম হইলে তাহাকে দুর্ব্বল বলিতে হইবে, ইহা স্বাস্থ্যের লক্ষণ নহে। ব্যায়াম সম্বন্ধে এত কথা বলিতাম না, তবে যখন একদিকে দেখিতেছি যে ব্যায়াম করিতে গিয়া অনেকের অনেক বিপৎ-পাত ও অপমৃত্যু ঘটিয়াছে, যখন দেখিতেছি ব্যায়ামকারী যুবক ও প্রৌঢ়ে ব্যায়াম ছাড়িয়া দিয়া নানারূপে রোগক্লিষ্ট হইতেছেন, অথচ বিনা ব্যায়ামে নিয়মিত রূপে চলিলে শরীর বেশ সুস্থ থাকে, তবে ব্যায়ামের পক্ষপাতী কেমন করিয়া হইতে পারি। আমরা যখন বিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণীতে পড়িতাম ১৮৭২ কি ১৮৭৩ সালে, তখন সার জর্জ্জ কেম্বল সাহেব বাঙ্গালার ছোটলাট, তিনি হুগলি কলেজে ডেপুটী ও সব-

ডেপুটী গিরির উপযুক্ত লোক প্রস্তুত করিবার জন্য "শিবিল সার্ব্বিস ক্লাস" নাম দিয়া কয়েকজন ছাত্রকে উপযুক্ত শিক্ষক দ্বারা শিক্ষিত করান। সেই শিক্ষার নানা অঙ্গ ছিল, সন্তরণ, অশ্বারোহণ, ব্যায়াম, শিক্ষণীয় ও পরীক্ষণীয় বিষয় ছিল। যাঁহারা মফঃস্বলে এই সকল কার্য্যের প্রয়াসী হইতেন তাঁহাদিগকে উক্ত সমস্ত কার্য্যে পটুতা দেখান প্রয়োজন বলিয়াই তদানীন্তন ছোটলাট বাহাদুর ব্যায়াম ও তাহার অপরাপর অঙ্গের সৃষ্টি করেন। এখনও যাঁহারা ঐরূপ কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন তাঁহাদের পক্ষে ঐ সকল কার্য্য দরকার হইতে পারে। শুনিয়াছি বেশ বলিষ্ঠ শরীর না হইলে শান্তি রক্ষা (Police) বিভাগে নাকি চাকরী মিলে না। সেই জন্যই বলিতেছিলাম যাহাদের জীবিকা অর্জ্জন জন্য শারীরিক বল আবশ্যক তাহারা তাহার চেষ্টা করুন, ব্যায়াম করুন, ঘোড়ায় চড়ুন, আর ও কত কি করিতে হয় করুন। কিন্তু তাহা সকলের জন্য নহে। ব্রাহ্মণের জন্য নহে। ব্রাহ্মণের উপযুক্ত উপজীবিকা অর্থাৎ কেবল বিদ্যাবুদ্ধির প্রয়োগ দ্বারা যাহাদিগকে জীবিকার্জ্জন করিতে হইবে তাহাদের শরীরে বলের ও আবশ্যক নাই, ব্যায়ামেরও দরকার নাই। আবার ব্রাহ্মণের পক্ষে জীবিকার্জ্জন জীবনের উদ্দেশ্য নহে, ইহা সামান্য সাময়িক প্রয়োজন মাত্র। পূর্ব্বেই যাহা বলিয়াছি আবার বলি ব্রাহ্মণ চান কি? ব্রাহ্মণ চান বিদ্যা, ধর্ম্ম ও জ্ঞান এবং জ্ঞানের অবশ্যম্ভাবী ফল মোক্ষ।

ক্রমে ছোট হইতে বড় কথা আসিয়া পড়িতেছে। এক্ষণে আমার বক্তব্য বোধ হয় স্পষ্ট প্রকাশ হইয়াছে; ব্যায়াম তোমার পক্ষে আবশ্যক নহে সুতরাং তাহা কর্ত্তব্য নহে, তবে যদি বিদ্যালয়ের শাসনাধীনে কিছু করিতে হয় তাহা অবশ্য করিবে, কারণ নিয়ম পালন অবশ্য কর্ত্তব্য, নিয়ম লঙ্ঘন করা মহা দোষ।

গৃহ প্রত্যাগমন। বিদ্যালয় হইতে বাটী ফিরিয়া আসিয়া বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া হস্ত পদাদি ধৌত করিয়া তোমার জননী যাহা কিছু খাইতে দেন তাহা আহার করিয়া অল্প-কিছুকাল বিশ্রাম স্বরূপ তোমার ছোট ছোট ভাই ভগ্নী বা ভাগিনেয় প্রভৃতি যাহারা বাটীতে আছে, তাহাদের লইয়া আমোদ আহ্লাদ করিবে। সমস্ত দিন নিজের কার্য্যে ব্যস্ত থাকিলে যাহারা স্নেহ ও যত্নের পাত্র, যাহারা তোমার নিকট স্নেহ ও যত্ন পাইলে সুখ বোধ করিবে, তাহারা মনঃক্ষুণ্ণ হইতে পারে এবং এইরূপ ক্রমাগত বেশি দিন ধরিয়া হইলে পর, তোমার স্নেহ ও যত্নের সম্বন্ধে তাহাদের মনে বিপরীত ভাবের উদ্রেক হইতে পারে, তাহাতে ক্রমশঃ আত্মীয়গণের মনের ভাব বা সাময়িক অবস্থা না বুঝিয়া তোমার ভালবাসা কমিয়া যাইতে পারে। এই এক কথা, সর্ব্বদা পড়াশুনা করিয়া মনে সময়ে সময়ে যাহাতে একটু আনন্দ হয় অথচ মন বেশি আকৃষ্ট বা যুক্ত না থাকে এমন একটা কার্য্য অন্বেষণ করিয়া সেই সময়ে এই সকল সরলতার মূর্ত্তিস্বরূপ ছোট ছোট

বালক বালিকাগণ লইয়া তাহাদের মত হইয়া, সেইরূপ সরল শৈশব ভাবে কিছু সময় কাটান বড় ভাল। খেলার সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের অকপট ব্যবহার দেখিয়া যে সরলতা পরে সংসারে প্রবেশ করিয়া বড় বেশি খুঁজিয়া পাইবে না তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পার। সুতরাং এ সুযোগ ছাড়া উচিত নহে। আরও এক কথা, যে ব্যায়াম সম্বন্ধে উপরে এত কথা বলিলাম তাহার উদ্দেশ্যও কিয়ৎ পরিমাণে সাধিত হইতে পারে। তুমি মধ্যে মধ্যে আমোদ করিয়া ভাগিনেয় ভাগিনেয়ীদের যেরূপ স্কন্ধে ও পৃষ্ঠে করিয়া দৌড়াদৌড়ি কর, তাহাতে তোমার ও তাহাদের যথেষ্ট অঙ্গ চালনা হয়, সঙ্গে সঙ্গে আমোদও হয়। তাহারা তোমার সঙ্গ ও আদর পাইয়া আহ্লাদে গলিয়া যায়, তুমি তাহাদের আমোদে খুব আনন্দিত হও। এইরূপে তুমি যখন তাহাদের লইয়া খেলা কর এবং তাহারা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া আনন্দ ধ্বনি করে, শুনিলে সকলেরই আনন্দ হয়। এইরূপ ক্রীড়া সকলেরই পক্ষে মঙ্গলকর। এইরূপ ক্ষণকাল ক্রীড়া কৌতুক উপভোগ করিয়া যদি সন্ধ্যা হইতে বিলম্ব থাকে সে সময়টা কিছু কিছু পড়াশুনা করিবে।

সায়ংকৃত্য। পরে সন্ধ্যার সময় সায়ং সন্ধ্যা করা কর্ত্তব্য। সায়ংসন্ধ্যা সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিবার আছে। আমাদের গ্রাম হালিসহর ভাগীরথীর পূর্ব্ব তীরে অবস্থিত। আমরা বাল্যে দেখিতাম, গ্রামের যত ব্রাহ্মণ

বাঁধা ঘাটের ধারে বসিয়া সায়ংসন্ধ্যা করিতেন। এইরূপে প্রত্যেক বাঁধা ঘাটে অনেক ব্রাহ্মণকে সন্ধ্যা করিতে দেখা যাইত। ৺কাশীধামে দশাশ্বমেধ ও তৎ পার্শ্বস্থ অহল্যা-বাইয়ের ঘাটের ও মুন্সীঘাটের সান্ধ্যদৃশ্যও তদ্রূপ। প্রত্যেক ঘাটে কত ব্রাহ্মণ একত্র বসিয়া সায়ংসন্ধ্যা করেন। এইরূপ গঙ্গাতীরে সন্ধ্যা করার প্রথা পূর্ব্বে ছিল। প্রথাটি বড় ভাল। সমস্ত দিনের নানারূপ কার্য্য করিয়া সন্ধ্যাকালে পবিত্র মনে গঙ্গার নির্ম্মল বায়ু সেবন ও তৎসঙ্গে সঙ্গে গঙ্গার পবিত্র জলে সন্ধ্যা ক্রিয়া সমাপন করাতে দেহ মন উভয়ই পবিত্র হয়, কেমন একটা শান্তি, শরীর ও মনে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। তাহা ছাড়া একত্র অনেক বর্ষীয়ান্, প্রৌঢ়, যুবা ও বালকের এক সাধু উদ্দেশ্যে একত্র সমাবেশ একটা বড় মঙ্গলকর অনুষ্ঠান। ইহাতে পরস্পর এক মতাবলম্বী অনেক লোকের ভিতর বেশ একটু সহানুভূতি হয়, স্নেহ ভালবাসা জন্মে। বিভিন্ন বয়সের লোকের ভিতর ঐরূপ সদ্ভাব উভয়ের পক্ষেই হিতকর। এই সকল ভাবিয়া মনে হয় যদি প্রত্যহ সন্ধ্যার প্রাক্কালে গঙ্গাতীরে গিয়া তথায় সন্ধ্যা করিয়া আসিতে পার ভাল হয়, ইহাতে গঙ্গাতীরে যাতায়াত জনিত একটু পরিশ্রম হয়, তাহাতে এখনকার কালের নিরুদ্দেশ্যে বা স্বাস্থ্যোদ্দেশ্যে সান্ধ্য ভ্রমণের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে, অথচ তোমার একটী প্রাত্যহিক কার্য্য নিয়মিত ভাবে নির্ব্বাহিত হইতে পারিবে।

অনেক ব্রাহ্মণ আজকাল সন্ধ্যার সময় মাঠে ও পথে ঘুরিয়া বেড়াইয়া সায়ং-সন্ধ্যার কাল অতিক্রম করিয়া বাটীতে আসিয়া সন্ধ্যা করিয়া থাকেন। তাঁহারা যদি সন্ধ্যাকালে গঙ্গার ঘাটে গিয়া সন্ধ্যা করিয়া আসেন তাঁহাদের বেড়ানও হয় যথাকালে গঙ্গার পবিত্র জলে, গঙ্গার সুবিমল, সুস্নিগ্ধ বায়ু সেবন করিতে করিতে সন্ধ্যাও করিতে পারেন। এরূপ ভাবে সায়ংসন্ধ্যা সমাপন করিলে সকল দিকই রক্ষা হইতে পারে।

পাঠাভ্যাস ও শয়ন। সায়ংসন্ধ্যা সমাপনান্তে পাঠাভ্যাস করিবে। অধিক রাত্রি জাগরণ করিয়া পাঠাভ্যাস করা স্বাস্থ্যহানিকর, তাহা কখন করিবে না। ঠিক নিয়মিত এক-সময়ে সন্ধ্যার পর আহার করিবে। আহার সম্বন্ধে উপরে যাহা বলা হইয়াছে তৎসমস্ত স্মরণ রাখিবে। রাত্রিতে অপেক্ষাকৃত কম খাওয়া কর্ত্তব্য এবং গুরুপাক জিনিস যত কম আহার হয় ততই ভাল। আহারান্তে যদি পড়াশুনা করার অভ্যাস থাকে তাহা করিবে, তবে কখন রাত্রি দশটার অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত পড়িবে না। দশটার সময় শয়ন করিবার চেষ্টা করিবে। তবে এক কথা মনে রাখিবে, নিদ্রার চেষ্টা না হইলে, শয্যা গ্রহণ করিবে না। যেমন আহারের পূর্ব্বে ক্ষুধা হওয়া চাই, পানের পূর্ব্বে তৃষ্ণা হওয়া চাই, সেইরূপ শয়নের পূর্ব্বেই নিদ্রালু হওয়া চাই। নিদ্রা হইতেছে না, অথচ শয্যায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করার মত স্বাস্থ্যহীনতার

লক্ষণ আর কিছুই নাই। নিদ্রা সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্ব্বে শয্যা সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। শয্যার পারিপাট্য বিলাসের লক্ষণ। শয্যা যত কম হইবে, যত সামান্য হইবে ততই ভাল। বিদ্যার্থীর পক্ষে পরিষ্কার শুষ্ক ভূমির উপর যাহা কিছু হয় একটা আস্তরণ ও একটা বালিশ হইলেই যথেষ্ট শয্যা মনে করা চাই। যদি ভূমি বেশ পরিষ্কার ও শুষ্ক না হয় তাহা হইলে খাট কি তক্তাপোষের উপরে শয্যা করা কর্ত্তব্য। ভূমি পরিষ্কার ও শুষ্ক কিনা তাহার প্রতি লক্ষ রাখা চাই। অপরিস্কৃত বা সজল বা সরস ভূমিতে শয্যা করিলে শীঘ্রই পীড়া হইবার সম্ভাবনা। শয্যার পারিপাট্য বিলাসের লক্ষণ বলিয়াছি। কিন্তু পরিষ্কার শয্যা পারিপাট্যের লক্ষণ নয়। নিতান্ত কোমল শয্যায় প্রতিনিয়ত শয়ন করা উচিত নহে, বিশেষতঃ তোমাদের পক্ষে। আহারের যেমন স্থালীর বিষয় কম বিবেচ্য। স্বর্ণ বা রৌপ্য পাত্রেই খাও, আর কাংস্য বা পিত্তল পাত্রেই খাও, ক্ষুধা না থাকিলে যাহাতে আহার কর মিষ্টলাগে না, আর ক্ষুধিতাবস্থায় যে কোন পাত্রে খাও সমান মিষ্টই লাগে, শয্যা সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা। যদি নিদ্রালু হইয়া থাক যে কোন শয্যায় শুইলেই সুনিদ্রা হইবে, নচেৎ যেমন অনেক নিষ্কর্ম্মা বিলাসীলোকের হইয়া থাকে, দুগ্ধফেন-নিভ কোমল শয্যায় শয়ন করিয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে হয়।

চিকিৎসকের নিকট শুনিয়াছি নাকি শক্ত শয্যায় শয়ন অভ্যাস থাকিলে অনেক পীড়ার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়। তাহা হউক বা নাই হউক শক্ত শয্যায় শয়ন অভ্যাস বড় উপকারী। এ সম্বন্ধে আমার জীবনের এক দিনের একটি গল্প বলিতেছি। আমি কয়েকজন বন্ধুসহ একবার শীতকালে মফঃস্বলের একটি বালিকা বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ করিতে গিয়াছিলাম। আমরা অনেকে গিয়াছিলাম তন্মধ্যে একজন কেবল জীবিত নাই, তিনি সুবিখ্যাত লেখক ৺পণ্ডিত রজনীকান্ত গুপ্ত, অপর যে কয়জন গিয়াছিলেন সকলেই জীবিত আছেন। আমাদের সকলেরই উক্ত বিদ্যালয়ের সম্পাদক মহাশয়ের প্রশস্ত বৈঠকখানায় রাত্রি যাপন করিবার আয়োজন হইয়াছিল। বৈঠকখানায় আগা গোড়া তক্তপোষ পাতা তাহার উপর শতরঞ্চ এবং তদুপরে পরিষ্কার চাদর বিস্তৃত। শয়নের জন্য গৃহস্বামী আমাদের দশ বার জনকে এক একটি করিয়া বালিশ ও লেপ দিয়াছিলেন। আমি কিছু কাল নিদ্রার পর জাগ্রত হইয়া দেখি আমার পার্শ্বে আমার একজন বন্ধু ছট্‌ফট্ করিতেছেন ও জাগিয়া রহিয়াছেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায় বুঝিলাম তিনি মোটেই নিদ্রা যান নাই, কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন যে কোন বিছানা পাতা না থাকায় শক্তশয্যায় তাঁহার নিদ্রা হয় না। আমার লেপটি তাঁহাকে পাতিবার জন্য দিতে চাহিলাম। কারণ বাকি যে টুকু রাত্রি অবশিষ্ট ছিল, গাত্রবস্ত্র

যাহা ছিল তাহাতেই আমার যথেষ্ট শীত নিবারণ হইত। তিনি কিন্তু ভদ্রতার অনুরোধে তাহা লইলেন না, কিন্তু তাঁহার মোটেই নিদ্রা হইল না। তাঁহার কষ্ট দেখিয়া আমার বড় কষ্ট হইয়াছিল। অভ্যাসের জন্য মানুষের একই অবস্থায় কিরূপে সুখ ও দুঃখের তারতম্য হয় দেখিলাম। যাঁহারা শক্ত শয্যায় শয়ন অভ্যাস করিয়াছেন তাঁহাদের কোমল শয্যায় শয়নে কখনও কষ্ট বোধ হয় না, কিন্তু বিপরীত অভ্যাসাপন্ন লোকের অবস্থান্তর হইলে কি বিষম কষ্ট। সেই জন্য সাংসারিক ভাবে দেখিলে ও শক্ত শয্যায় শয়নাভ্যাস করা ভাল। নিদ্রা হেয় জিনিস নয়। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা প্রভৃতি মানুষের নৈসর্গিক বৃত্তি। ইহা অপকৃষ্ট বস্তু নহে। কিন্তু এই সকল বৃত্তিকে চিরদিনই সাবধানে সীমাবদ্ধ রাখা কর্ত্তব্য। ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও লোভ লালসার প্রভেদ বুঝিতে পারা চাই। যতটুকু পানাহার ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবারণ জন্য ঠিক তাহাই ব্যবহার করা চাই। তদতিরিক্ত যাহা আহার বা পানকরা যায় তাহা লোভ লালসার বশবর্ত্তী হইয়া করিতে হয়, ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। অধিক সুমিষ্ট উপকরণের উপরোধে অধিক আহার করা বা সুমিষ্ট ও সুঘ্রাণযুক্ত পেয় বলিয়া অধিক পরিমাণে পান করা তৃষ্ণা নিবারণ করিবার জন্য নহে, ইহা লোভে লালসার পরিচয় মাত্র। আমার একজন বন্ধু আছেন, তিনি যৌবনে একটি নিয়ম করিয়া আহার করিতে বসিতেন। ভোজনের সময় তাঁহাকে যাহা কিছু দেয় সমস্ত এককালে দিতে হইত।

তিনি অগ্রে সমস্ত ব্যঞ্জনাদি আহার করিতেন, পরে কেবল মাত্র লবণোপকরণে ভাত খাইতেন। তিনি বলিতেন ইহাতে ঠিক ক্ষুধার পরিমাণ মত আহার করা হয়। তাঁহার এইরূপ অসাধারণ আচরণের জন্য অনেকে অনেকরূপ ব্যঙ্গ করিতেন; কেহ কেহ পাগল বলিয়া শ্লেষ করিতেও ত্রুটী করিতেন না। আমি এরূপ করিতে কাহাকেও বলি নাই, তবে ক্ষুধা তৃষ্ণার অতিরিক্ত পানাহার যে দোষযুক্ত তাহাই বলিতেছি। ক্ষুধা তৃষ্ণানুযায়ী পানাহার যেমন প্রয়োজন, নিদ্রার পরিমাণানুসারে শয়ন ও তদ্রূপ আবশ্যক, চেষ্টা করিয়া অধিকক্ষণ নিদ্রা যাইবার প্রয়াসকে জাড্য বা আলস্য বলা যাইতে পারে, ইহা ব্যসন মধ্যে পরিগণিত, কিন্তু তাহা নিদ্রা নহে। শয্যাগ্রহণ কালে ভগবানকে স্মরণ করিয়া নিদ্রা যাইবে। নিদ্রার কাল ছয় ঘণ্টা হইলেই চলিবে। ইহা আয়ুর্ব্বেদ-সম্মত। রীতিমত সকল কালেই রাত্রি দশটার সময় হইতে ৪টা পর্য্যন্ত নিদ্রা যাইলেই যথেষ্ট শ্রান্তি দূর হয়। ইহা অপেক্ষা কম করা উচিত নয়। অনেক ছাত্র পরীক্ষার সময় অধিক রাত্রি জাগরণ করেন। সেটা তাঁহাদের বড় অন্যায়, তাহাতে স্বাস্থ্যহানি হইয়া থাকে। যদি প্রতি নিয়ত ছয় ঘণ্টা করিয়া নিদ্রা যাওয়া হয় এবং অবশিষ্ট সময়ের সদ্ব্যবহার করা হয় তাহা হইলে পরীক্ষার অব্যবহিত পূর্ব্বে অধিক রাত্রি জাগিয়া স্বাস্থ্যহানি করিতে হয় না। অধিক রাত্রিতে পাঠ করিয়া বিশেষ যে কিছু ফল হয়, তাহা বোধ

হয় না। যখন পৃথিবী বাহিরে তমসাচ্ছন্ন থাকে, তখন মানুষের বুদ্ধি ও কেমন যেন এক রকম তমসাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, ভাল ভাবের স্ফূর্ত্তি হয় না, বরং অনেক অসৎ ভাবের উদ্রেক হয়। সূর্য্যের সহিত আমাদের বুদ্ধি বৃত্তির কি যেন একটা সম্বন্ধ আছে। সেই জন্যই বোধ হয় আমরা সূর্য্যোদয় হইতেই সূর্য্যের উপাসনা আরম্ভ করি। সূর্য্যের সহিত শরীরের যে বিশেষ সম্বন্ধ তাহা যিনি যে কোন পীড়াগ্রস্ত হইয়াছেন তিনিই বুঝিবেন। সকল পীড়ার আতিশয্যই রাত্রিতে। যত কিছু যন্ত্রণা রাত্রিতে উপলব্ধি হয়। সাধারণতঃ আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে দেব দেবীর পূজা, বিশেষ উপলক্ষ ভিন্ন, রাত্রিতে নিষিদ্ধ। রাত্রিতে আমাদের বুদ্ধি বাহিরের পৃথিবীর ন্যায় তমসাচ্ছন্ন থাকে সদ্বৃত্তির উদ্রেকের উপযুক্ত সময় নয় বলিয়াই, বোধ হয় সৎকর্ম্মের নিষেধ হইয়াছে। সেই জন্য বলিতেছি যখন সৎবুদ্ধির উন্মেষ না হইবারই কথা সে সময় বিদ্যা বুদ্ধির কাজ না করাই ভাল। সে সময় নিদ্রা যাইয়া শরীরের সমস্ত দিনের ক্লান্তি দূর করাই কর্ত্তব্য। ইহা নৈসর্গিক নিয়ম। ইহা জানিয়া চলাই ভাল।

অবকাশ কালে—সাধারণতঃ শয্যাত্যাগ হইতে পুনঃ শয্যা-গ্রহণ কাল পর্য্যন্ত যাহা যাহা কর্ত্তব্য স্থূল ভাবে তাহা বলা হইল; কিন্তু একটা বিষয় এখনও বলিতে বাকি আছে তাহা বলিয়াই বর্ত্তমান প্রবন্ধের শেষ করিবার ইচ্ছা। উপরে

যাহা বলিলাম যখন বিদ্যালয়ে যাইতে হইবে অর্থাৎ যে দিন অবকাশ না থাকিবে সেই সকল দিনের জন্য। রবিবার ও অপরাপর অবকাশের দিনে কি কার্য্য করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। যে সময় তোমার অবকাশ থাকিবে কেবল এক গ্রীষ্মাবকাশ ছাড়া প্রায় সেই সময়ে আমারও অবকাশ থাকে। আহারান্তে অবকাশের দিনে বাঙ্গালা সাহিত্যানুশীলন করিবে। নূতন ও প্রাচীন গ্রন্থকার গণের রচনা পাঠ করিবে। তাহা ছাড়া রামায়ণ, মহাভারত ও অপরাপর পুরাণ গুলি ও যথা সাধ্য পাঠ করিবে, ইহাদের অধিকাংশই বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে, বাস্তবিক ৺কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত, ৺হেম চন্দ্র ভট্টাচার্য্যের রামায়ণ প্রভৃতি অনুবাদ অতি চমৎকার ও সাহিত্য শিক্ষার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এই সকল পাঠ ব্যতীত বঙ্গ সাহিত্যে অনেক ভাল ভাল গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে ও হইতেছে, সময়ে সময়ে যত্ন পূর্ব্বক তাহা পাঠ করিবে। কেবল বাঙ্গালা সাহিত্য পাঠ করিয়াই ক্ষান্ত হইবে না, মধ্যে মধ্যে বাঙ্গলা ভাষায় প্রবন্ধ লিখিবে। ইংরাজিতে যে কোন ভাল ভাব সংগ্রহ করিতে পারিবে, তাহা আয়ত্তাধীন হইল কিনা বুঝিবার জন্য বাঙ্গালায় প্রবন্ধাকারে তাহা লিখিবে। এই সকল প্রবন্ধ লিখিয়া তোমার অধ্যাপকগণের মধ্যে যাঁহার যখন অবকাশ থাকে, তাঁহাকে অনুগ্রহ করিয়া সংশোধন করিয়া দিবার জন্য বলিবে। আমার বন্ধুবর্গের ভিতর

অনেক গুলি খ্যাতনামা বঙ্গসাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ মনীষী আছেন, তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইলেও তাঁহারা দয়া করিয়া তোমার প্রবন্ধগুলি সংশোধন করিয়া দিতে পারেন। এ সম্বন্ধে স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়কে তাঁহার জনৈক হিতৈষী সাহেব-বন্ধু যে উপদেশ দিয়াছিলেন, আমি তোমাকে তাহা স্মরণ করাইতেছি। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বড় মান্য করিতেন বলিয়া উপদেশ দেন, যে বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত যথেষ্ট জানেন, অনেক পড়িয়াছেন, এখন "ইংরাজী পড়ুন ও বাঙ্গালা লিখুন।" বিদ্যাসাগর মহাশয়ও তাহাই করিয়াছিলেন, তদবধি তিনি প্রভূত পরিমাণে ইংরাজী সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞানাদি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বলিতে কি তিনি যেরূপ ইংরাজী গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন কয় জন বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা ইংরাজীওয়ালা লব্ধ প্রতিষ্ঠ লোক তাহা পড়িয়াছেন? তিনি কিন্তু লিখিতেন বাঙ্গালা। তাঁহার অধিকাংশ গ্রন্থই অনুবাদ। সংস্কৃত ও ইংরাজী গ্রন্থের ভাব সংস্কৃত ছাঁচে ঢালা বাঙ্গালা ভাষায় কি সুন্দর রূপেই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সেই উপদেশের মাহাত্মেই বিদ্যাসাগর মহাশয় চিরজীবী হইয়াছেন। বঙ্গ সাহিত্যই তাঁহাকে চিরজীবী করিয়া রাখিবে। তাঁহার অসাধারণ দানশীলতা, সহৃদয়তা, পরোপকার-স্পৃহা, তাঁহার সে জগৎজোড়া ভালবাসা, তাঁহার সে অগাধ পাণ্ডিত্য, অসীম স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা, স্বাধীন চিত্ত, নির্ভীক নির্লোভ হৃদয়

সকলই কালে মানুষ ভুলিয়া যাইবে, তাঁহার জীবন চরিত্র লেখক গণের প্রভুত প্রয়াস সত্ত্বেও, তৈল চিত্রের ছবি ও প্রস্তরের বিকৃতাকৃতি প্রতিমূর্ত্তি সত্ত্বেও তাঁহাকে লোকে ভুলিয়া যাইবে, কিন্তু যাঁহারা বঙ্গ সাহিত্য পাঠ করিবেন, বঙ্গভাষা যতদিন সজীব থাকিবে, ততদিন, সেই উদার উপদেশের বলে, সেই "ইংরাজী অধ্যয়ন ও বাঙ্গালা রচনার" গুণে তিনি চিরজীবী থাকিবেন। আমি ও তোমাকে সেই মহৎ উপদেশের অনুকরণে বলি, সংস্কৃত ও ইংরাজী অধ্যয়ন কর এবং যেটি যেখানে ভাল ভাব দেখিবে, যেমন সুপুত্র দেশ ভ্রমণে গিয়া যেখানে যেটা ভাল জিনিস পায় পিতা মাতার জন্য বাটীতে আনয়ন করে, তুমি সেইরূপ বঙ্গভাষা জননীর হস্তে আনিয়া দিবে। এখন হইতে এই দিকে লক্ষ্য থাকিলে ভবিষ্যতে অনেক কার্য্য করিতে পারিবে। এইরূপে অবকাশকালে বঙ্গ সাহিত্যের দ্বিবিধ পরিচর্য্যা করিবে। সময় পাইলে অবকাশকালে যখন আমারও অবকাশ থাকিবে, আমার নিকট উপস্থিত থাকিবে, তাহাতে আমার নিকট যাঁহারা সর্ব্বদা আইসেন, আমাকে যাঁহারা দয়া করেন, ভাল বাসেন, তাঁহাদের সহিত তোমার পরিচয় হইতে পারিবে। আমার বন্ধুগণকে তোমার জানা আবশ্যক। আমার বন্ধুগণ সকলেই তোমার পিতৃস্থানীয়, পিতার ন্যায় ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁহাদের সহিত সেইরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। তাঁহারাও তাহা হইলে তোমাকে অপত্যনির্ব্বিশেষে স্নেহ

করিবেন, তোমার মঙ্গল কামনায় নিরত থাকিবেন। তাঁহাদের আন্তরিক আশীর্ব্বাদই তোমার জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রধান কারণ জানিবে।'

গ্রীষ্মাবকাশ অতি দীর্ঘ। এই সময় তুমি হালিসহরের বাটীতে অপরাপর পরিবারবর্গের সহিত বাস করিবে। সেখানে কিন্তু তোমার নিয়মিত ক্রিয়া উপরে যেরূপ নির্দ্দিষ্ট হইল তাহা ঠিক রাখা চাই। অধিকন্তু অপরাহ্নে যে সময় তোমাকে বিদ্যালয় হইতে ফিরিয়া আসিয়া ছোট ছোট ভাই ভগিনী প্রভৃতি লইয়া নির্দ্দোষভাবে ক্রীড়া করিতে বলিতেছি, সেইটির একটু অধিক পরিসর করিয়া দিবে সেখানে গিয়া নিজ পরিবার ছাড়া পল্লীস্থ সকল বালক বালিকা লইয়া ক্রীড়া করিবে। ক্রীড়াটা অবস্থানুসারে যাহাতে সকলের মনোমত হয় সেইরূপ করিবে। পাড়ার আগাছা জঙ্গল কাটা, মাটী খুঁড়িয়া বাগান করা, পথঘাট পরিস্কার করা প্রভৃতি সাধারণের উপকার জনক কার্য্যে সকলে আমোদ বোধ করিলে তাহাই করিবে আর মধ্যে মধ্যে বন-ভোজন কখনও ভুলিবে না।

পরিবারটা একটু বিস্তৃত মনে করিয়া তাহাদের সকলকেই সহোদর সহোদরা জ্ঞানে সকলের সঙ্গে হৃদয়ের সহিত মিশিবে ও সকলকে ভাল বাসিবে, সকলকে লইয়া আমোদ করিবে তোমার সহিত পল্লীবাসী বালক বালিকার যে এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হইবে তাহা অনেক সময়ে বড় সুখপ্রদ। পরস্পর

সেই ভালবাসাটুকু যাহাতে চিরস্থায়ী হয় তাহা করিবে। ক্রমশঃ এই ভালবাসাটুকু নিজ পল্লী ছাড়াইয়া গ্রামময় বিস্তার করিবে, আবার সময়ে উহা স্বগ্রামে আবদ্ধ না রাখিয়া স্বদেশের উপর, স্বজাতির উপর অর্পণ করিয়া নিজ জীবন ধন্য করিবে।

সমাপ্ত

পুত্রের প্রতি উপদেশ সম্বন্ধে মতামত

Amrita Bazar Patrika dated 18. 11. 26.

"We hail the appearance of this book with special pleasure. It supplies us much felt want in the carriculum of studies in the lowsr forms of schools. The author was at one time a notaable figure in the literary and social life of this city and earned the respect and welfare of all who came in contact wfth him by his high character and sterling worth. He has now taken to the llfe of a hermit and spends this evening of his day, in spiritual contemplation at Banares. He has unfolded the seheme of life that should be lived by our boys, so that they mfght enjoy health, strength, and self-expansion in every respect. Such a book was really needed to inculcate the lessons of purity and Brahmacharya in the minds of our boys and the author has deserved well of the Hindu public by laying bare in this fascinating way of his rich experience for the benefit of the young. Lord Chesterfieid's letters to his son occupy a high place in English Literature. The book before us will similarly be regarded as a safe guide to our boys in the ways of virtue and wholesome development. The defects of a godless system of education upon the young learners cannot be remedied by a better agency than that with which the venerable author has pro-

vided us in his wisdom and sagacity. Alike in matter and manner, inspiring in percepts and skilful presentation, the book leaves nothing to be desired and is calculated to produce a chastening and unlifting effect upon the minds for those for for whom it is intended. We should like to see it in the hands of every school boy and strongly recomend its use to our educational institutions."

Forward 30th May 1925.

"Putrer Pati Pitar Upadesh"

By Siba Prasanna Bhattacharyya. Edited by Shyamadas Bhattacharcharya B. L. from 5, Ram Kanta Mistri Lane.

The book under review is a highly instructive and interesting treatise from the pen of one who has renounced the world and is now living as an ascetic after devoting the best portion of his life to the cause of the welfare of Students.

In Course of a few letters to his son, who is now no more in the world, our author has described how a Hindu Student should live and regulate the daily work in order to be a man, in the true sense of he term.

The perusal of this book will convince every reader of the necessity of regularity and discipline which every young man should undergo in order to reach the desired goal of life. The author has very skilfully set forth the duties which every student

should perform for his self training. Further more what has contributed most to the interest of the book is a solemn note of deep religious sentiments, which is silently flowing throughout the book We are sure that this charming little volume will enthuse and greatly benefit not only our young men but their parents and guardians also.

The printing and the get up of the book are simply beautiful.

Rai Rasamoy Mitra Bahadur the late Head Master Hindu School, Calcutta.

writes dated 28. 11. 25.

"I have gone through "পুত্রের প্রতি উপদেশ" by Babu Siva Prasanna Bhattacharya, now Swami Sankar Paramananda Thirthaswami, with very great pleasure. Precepts from any father to his son must be good ; but coming from a father of Siva Prosona Babu's piety, goodness, experience and widom to a worthly son like Chandidas, pious and good even from his infancy, they are bound to be especially salutary and interesting. I wish the book to be placed in the hands of every Hindu Bengali Boy."